আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা
১৬-৩১ মার্চ ২০২০ ১-১৫ চৈত্র ১৪২৬

মূল্য : ৩০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী
subhanilc@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তর
আরেক রকম
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা
বার্ষিক সডাক ৭০০ টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে
'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে
আরেক রকম-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার
৯৪৩২২১৯৪৪৬

নিবেদন

অনেক গ্রাহকের চাঁদা বাকি পড়ে আছে। আলাদাভাবে প্রত্যেককে মনে করিয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। শুভানুধ্যায়ী গ্রাহকরা অনুগ্রহ করে গ্রাহকচাঁদা (বাৎসরিক ৭০০ টাকা) পাঠিয়ে পত্রিকার আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবেন এই আমাদের একান্ত নিবেদন। সহজে যাতে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারেন সেই জন্য আমাদের অ্যাকাউন্ট নম্বর চেয়েছেন অনেকে। নীচে নম্বরটি দেওয়া হল। অনুগ্রহ করে অনলাইনে টাকা পাঠালে গ্রাহক পরিষেবার দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রীরবিন মজুমদারকে ফোনে জানাবেন।

IFSC No. : UCBA0000703.
Current Account : 07030210002339
(সমাজচর্চা ট্রাস্ট, ইউকো ব্যাঙ্ক, পার্ক স্ট্রিট ব্রাঞ্চ, ৭৫সি পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।)

চেকে টাকা পাঠাতে হলে Samaj Charcha Trust-এর নামে চেক পাঠাতে হবে দপ্তরের ঠিকানায়।

—সম্পাদকমণ্ডলী
আরেক রকম

আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ১৬-৩১ মার্চ ২০২০,
১-১৫ চৈত্র ১৪২৬
Vol. 8, Issue 6th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয়
ইয়েস, আরেকটি ব্যাঙ্ক সংকট ৫
উজাড় ঘরের শান্তি ৭

সমসাময়িক
করোনা আক্রান্ত বিশ্ববাজার ১০
সুবিধেবাদই তা হলে মুখ্য? ১১
তালিবানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ১৩

নাগরিকত্বের নাগপাশে ভারতের উদ্বাস্তু সমাজ
নীতীশ বিশ্বাস ১৬

দেশের রাজনীতি ও বহুস্বর গণতন্ত্র
অশোকেন্দু সেনগুপ্ত ২১

উষ্ণায়নের হালচাল
প্রদীপ দত্ত ২৩

এ পরবাসে রবে কে
সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায় ২৯

অথ টোলরহস্যকথা ও একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন—২
দেবোজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায় ৩১

সত্তর থেকে কুড়িকুড়ি
শুভময় মৈত্র ৩৭

স্বপ্ন, সময়, ভালোবাসা
শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪২

পাখি দেখা, পাখি চেনা
সুভাষ ভট্টাচার্য ৪৬

চিঠির বাক্সো ৫০

পুনঃপাঠ
ভারতের জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের ধারার গুরুত্ব
গৌতম চট্টোপাধ্যায় ৫৩

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
ছবি: রামকিঙ্কর বেইজ
ভিতরের ছবি: তমালি দাশগুপ্ত

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা
বার্ষিক সডাক সাতশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

Social Scientist

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তথ্যনির্ভর চিন্তাশীল প্রবন্ধসমষ্টি। বছরে ছ'টি সংখ্যা। কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদার হার

এক বছর : ৩০০ টাকা

দুই বছর : ৫০০ টাকা

তিন বছর : ৬০০ টাকা

সম্পাদক

প্রভাত পট্টনায়ক

সম্পাদকমণ্ডলী

মধু প্রসাদ, উৎসা পট্টনায়ক, বি. রঘুনন্দন

সি. পি. চন্দ্রশেখর, জয়তী ঘোষ, বিশ্বময় পতি

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩৫এ/১ শাহপুর জাট

নতুন দিল্লি ১১০০৪৯

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

ইয়েস, আরেকটি ব্যাঙ্ক সংকট

হিন্দুত্বের জোয়ার এসেছে। তার ঢক্কানিনাদে কান পাতা দায়। 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ঢেকে দিয়েছে 'রাম রাম' সম্ভাষণ। দিল্লির দাঙ্গায় পোড়া মানুষ ও বাড়ির ধোঁয়ায় শ্বাস নেওয়া কঠিন হলেও মধ্যবিত্তের চিত্তে হিন্দু-হৃদয়-সম্রাটের ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতি এক বিন্দুও হ্রাস পায়নি। নীল সোফাসেটে বসে টিভির পরদায় জনৈক সাংবাদিকের সাম্প্রদায়িক হুংকার শুনতে শুনতে, 'মুসলমানরা খুব বাড় বেড়েছে' বলে চায়ে চুমুক দেওয়ার সময় হঠাৎ যেন গলায় আটকে গেল সান্ধ্যকালীন খাবার। আরেকটি ব্যাঙ্কের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। ইয়েস ব্যাঙ্ক ডুবে গেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথা সরকার নির্দেশিকা জারি করেছে ব্যাঙ্ক থেকে মাসে ৫০০০০ টাকার বেশি অর্থ সংগ্রহ করা যাবে না। আপনার আমানত কয়েক কোটি টাকা হলেও আপাতত ৫০০০০ টাকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যেই মধ্যবিত্ত হিন্দু, মুসলমানদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ভেবে তৃপ্ত হচ্ছিলেন তাঁর টাকাও ইয়েস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আত্মসাৎ করেছে। এমনকী স্বয়ং জগন্নাথ দেবের গচ্ছিত ৫৪৫ কোটি টাকার কী হবে কেউ উত্তর দিতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় নিজের অ্যাকাউন্ট কোন মহিলাদের হাতে তুলে দিলেন সেই নিয়ে জল্পনায় ব্যস্ত মিডিয়াকুল।

খামখেয়ালিপনা আর মুখেন-মারিতং-জগৎ ভাষণে শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু তা দিয়ে অর্থব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার দাবি মেটে না। যাঁরা এখনও ভারতের অর্থব্যবস্থার সমস্যা মোকাবিলায় মোদী সরকারের ব্যর্থতা আতশকাচ দিয়েও খুঁজে পাচ্ছেন না, তাঁদের তাকাতে হবে ইয়েস ব্যাঙ্কের ঘটনাপ্রবাহের দিকে। ইউপিএ আমল থেকেই আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনাদায়ী ঋণের সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমানে ৯ লক্ষ কোটি টাকার উপর অনাদায়ী ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে যার অধিকাংশই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের খাতায় রয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদান করার বিধি কঠোর করেছে, অনেক ব্যাঙ্ককে ঋণ দেওয়া থেকে বিরত করা হয়েছে। এর প্রভাবে ভারতে ব্যাঙ্ক ঋণের বৃদ্ধির হার তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই প্রবণতার ব্যতিক্রম ইয়েস ব্যাঙ্ক।

২০১৪ সালে মোদী সরকার যখন ক্ষমতায় আসে ইয়েস ব্যাঙ্কের মোট প্রদেয় ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৫০০০ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪১০০০ কোটি টাকা। এই সময়কালে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থেকে প্রদেয় মোট ঋণের পরিমাণ কমে গেছে, অথচ ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রদেয় ঋণ চারগুণ বেড়ে গেছে! অর্থশাস্ত্রীগণ

শুধুমাত্র এই দুটি পরিসংখ্যান দেখেই বলে দিতে পারেন যে ইয়েস ব্যাঙ্কের সর্ষের মধ্যে ভূত থাকার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইডি, সেবি সবাই নির্বিকার। এতটাই তাদের ঔদাসীন্য যে ২০১৬-১৭ এবং ২০১৮-১৯ সালের মধ্যে ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রদেয় ঋণের বৃদ্ধির হার ৮০ শতাংশের বেশি হলেও তাঁরা চুপচাপ বসে আকাশের তারা গুনছিলেন। ২০১৬-১৭ সালে ইয়েস ব্যাঙ্কের মোট প্রদেয় ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩২০০০ কোটি টাকা যা ২০১৮-১৯ সালে বেড়ে হয় ২৪১০০০ কোটি টাকা। এই বিশাল পরিমাণ ঋণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ প্রদান করলেও তার ছিটেফোঁটাও আদায় করতে পারেননি। অতএব ব্যাঙ্কের নিট মূল্য শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। ঋণের এই বিপুল বৃদ্ধি দেখেই সরকারি নিয়ন্ত্রক এবং প্রশাসকদের সচেতন হওয়া উচিত ছিল। এই বিপুল পরিমাণ ঋণ কোথায় দেওয়া হচ্ছে কারা পাচ্ছে আর কেন এই ব্যাঙ্ক এত ঋণ প্রদান করছে তার তদন্তের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা করা হল না। কেন?

দুটি সম্ভাবনা আছে। এক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি হয় অদক্ষ না হয় মূর্খ। যেই দেশে মাত্র বছর কয়েক আগে বিজয় মাল্য, নীরব মোদী, মেহুল চোকসির মতন প্রধানমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ অসাধু ব্যবসায়ী বা বকলমে ডাকাতেরা ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করে দেশান্তরী হয়েছে, সেই দেশের আর্থিক প্রশাসনের ঘুম চলে যাওয়া উচিত একটি ব্যাঙ্কের এই প্রবল ঋণের বৃদ্ধি দেখে। কিন্তু তা হয়নি। যেহেতু তা হয়নি আমাদের ঝুঁকতে হবে দ্বিতীয় সম্ভাবনার দিকে।

এহেন বিশাল ঋণ বৃদ্ধির মাধ্যমে লাভবান হয়েছেন কারা? স্বয়ং অর্থমন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন অনিল আম্বানি গ্রুপ, এসেল গ্রুপ, আইএফএলএস, ডিএইচএফএল এবং ভোডাফোন ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলি যারা ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ ঋণের ভারে ন্যুব্জ, তারা ইয়েস ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান ঋণ গ্রাহক।

অনিল আম্বানি প্রধানমন্ত্রীর মিত্র। অনিল আম্বানি তাঁর বাল্যকালে কাগজের প্লেন নিশ্চিত উড়িয়েছেন। এ ব্যতীত তাঁর বিমান নির্মাণের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও রাফাল বিমানের যন্ত্রাংশ তৈরি করার বরাত তিনিই পান, যা নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেকনজরে না থাকলে কাগজের বিমান বানানো থেকে সোজা রাফাল বিমানের যন্ত্রাংশ তৈরি করার বরাত পাওয়া দুষ্কর। ২০১৯ সালের জুলাই মাসের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী অনিল আম্বানি গোষ্ঠীর মোট ঋণের পরিমাণ ৮৬০০০ কোটি টাকার বেশি। আবার তিনিই লন্ডনের একটি মামলায় নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছেন। অথচ ইয়েস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অনিল সাহেবকে কোটি কোটি টাকার ঋণ প্রদান করতে দ্বিধা বোধ করেননি। একইভাবে এসেল গ্রুপের কর্ণধার সুভাষ চন্দ্র বিজেপি সমর্থিত রাজ্যসভার সাংসদ। তাঁর বইয়ের উদ্বোধন করেছেন স্বয়ং মোদী, তাঁর টিভি চ্যানেলে দিবারাত্রি মোদী ভজনা চলে। এদিকে বাজারে তাঁর থেকে পাওনাদারেরা ৭০০০ কোটি টাকার বেশি অর্থের দাবি করছে। তাঁকে ঋণ দিতেও ইয়েস ব্যাঙ্কের কোনো অসুবিধা হয়নি। 'ক্রোনিইজম' বা ধান্দার ধনতন্ত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ইয়েস ব্যাঙ্কের পতন আগামীদিনে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো হবে।

আইএফএলএস নামক আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই ডুবে গেছে। ডিএইচএফএল আরেকটি বহু বিতর্কিত কোম্পানি যা ডুবতে বসেছে এবং যার সঙ্গে দাউদ ইব্রাহিমের সম্পর্ক রয়েছে বলে গোয়েন্দারা বলেছেন। এই ডিএইচএফএল-কে ইয়েস ব্যাঙ্ক ৩০০০ কোটি টাকার উপর ঋণ দেয়। আবার ডিএইচএফএল-এর একটি অনুসারি কোম্পানি থেকে ইয়েস ব্যাঙ্কের কর্ণধার রাণা কাপুর ৬০০ কোটি টাকার ঋণ দেন। এই সমস্ত কার্যকলাপ বেআইনি এবং সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকা লুট করার ছকের অন্তর্গত। অবশেষে ইডি রাণা কাপুরকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু ইয়েস ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদান নিয়ে গভীর তদন্ত হওয়া উচিত। একাধিক শিল্প গোষ্ঠী ইয়েস ব্যাঙ্কের এই অস্বাভাবিক ঋণ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি কী করছিল সেই প্রশ্নও উঠছে। এই ক্ষেত্রে আর্থিক কেলেঙ্কারি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই নিরপেক্ষ তদন্ত একান্ত জরুরি।

সরকারের কাছে অবশ্য তদন্তের বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পায়নি। বরং সরকার এখন ব্যস্ত ইয়েস ব্যাঙ্ক এবং তার আমানতকারীদের বাঁচাতে। অবশ্যই আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? সোজা সাধারণ যে পদ্ধতি তা হল যাঁরা ইয়েস ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে ফেরত দেননি, তাঁদের সবার নাম প্রকাশ করে তাঁদের সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা আদায় করে আমানতকারীদের ফেরত দেওয়া। কিন্তু তা করলে অনিল আম্বানি, সুভাষচন্দ্রের মতন পুঁজিপতিদের জেলে ঢোকাতে হয়। মোদী তো শুধু হিন্দু-হৃদয়-সম্রাট নন, তিনি ভারতের পুঁজিপতিদের হৃদয়সম্রাটও বটে। অতএব যা করণীয় তার ঠিক বিপরীত কাজটি সরকার করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এসবিআই-কে বাধ্য করা হচ্ছে ইয়েস ব্যাঙ্কের

৪৯ শতাংশ শেয়ার কিনে নিতে যার জন্য এসবিআইকে খরচ করতে হবে ২৪৫০ কোটি টাকা। ইয়েস ব্যাঙ্ককে অধিগ্রহণ করলে ইয়েস ব্যাঙ্কের যাবতীয় অনাদায়ী ঋণ এসবিআই-এর খাতায় চলে আসবে। এসবিআই-এর জমানো টাকা দিয়ে পুঁজিপতিদের আর্থিক স্বেচ্ছাচারীতার মূল্য চোকানো হবে। সাধারণ মানুষের গচ্ছিত টাকা ব্যয় করা হবে অনিল আম্বানির দেউলিয়া হওয়ার গর্ত ভরাট করতে! সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!

ইয়েস ব্যাঙ্ক বাঁচাও প্রকল্প এসবিআই-এর মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার একমাত্র প্রকল্প নয়। আইডিবিআই ব্যাঙ্ক যখন ডোবার মুখে মোদী সরকার জীবনবিমা নিগম বা এলআইসি-কে বাধ্য করে আইডিবিআই ব্যাঙ্কে টাকা ঢালতে। এত কাণ্ড করার পরে এই বছরের বাজেটে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এলআইসি-র কিছু শেয়ার তারা বাজারে বিক্রি করবে এবং আইডিবিআই-কেও বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হবে। এলআইসি, এসবিআই-এর মতন লাভজনক সংস্থাগুলির দিকে ক্ষুধার্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে বেসরকারি পুঁজিপতিদের হায়নার দল। বেসরকারিকরণের তত্ত্ব কপচাচ্ছেন অনেক অর্থনীতিবিদ। ইয়েস ব্যাঙ্কে টাকা ঢালা বা অন্যান্য রুগ্‌ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বাঁচানোর দায়িত্ব জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে। এই চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার আর্থিক স্বাস্থ্য। তখন এই ভগ্ন স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়েই বেসরকারিকরণের কোরাস গাইবে মিডিয়া-সরকার-ফান্ড-ব্যাঙ্ক-অর্থনীতিবিদ। এই পরিণতির থেকে বাঁচতে হলে রুগ্‌ণ বেসরকারি ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ঘাড়ে চাপানোর নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলি হয়তো লড়বে, তবে জনগণের মধ্যে তা নিয়ে খুব বেশি আলোড়ন হবে কি?

উজাড় ঘরের শান্তি

"রাজ্যের মঙ্গল হবে?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখি দুই ভাই হানে ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য করে মৃত্যুমুখী ছুরি, রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে? রাজ্যে শুধু সিংহাসন আছে— গৃহস্থের ঘর নেই, ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা?" (বিসর্জন)

দেশ ভাগের পরে ১৯৪৭-এ দিল্লিতে যখন নানা ধর্মের মানুষের রক্তে ভিজে উঠেছে, উর্দু কবিরা গালিব আর ইকবালের থেকেও বেশি আশ্রয় করেন কবি মীর তকি মীরের (জন্ম ১৭২৩ মৃত্যু ২১ সেপ্টেম্বর ১৮১০)। মীর তকি মীর লিখেছিলেন নাদির শাহের দিল্লি লুঠের পর—

দিলহে খুশতরহ মাকাঁ ফিরভি কাহিঁ বনতে হ্যায়
ইস ইমারত কো টুক ইক কর ঢায়া হোতা।
(হৃদয়ের মতো সুন্দর ঘর কি আর তৈরি হয়?
ভাঙবার আগে যদি একটু তাকিয়ে দেখতে ইমারত)

মীর তকি মীরকে দিল্লি ছাড়তে হয়। চলে যেতে হয় লক্ষ্ণৌ। ইংরেজের তলোয়ারের আড়ালে গড়ে উঠল বাইরে চমকদার ভেতরে ফাঁপা সংস্কৃতি। দিল্লিতে হত কবিতায় মোলাকাত, এখানে মোরগ লড়াইয়ের আসরে দেখা হয় কবির সঙ্গে নবাবের। কষ্টে বেদনায় হৃদয়ের যন্ত্রণায় কবি লেখেন—

যদি কখনো দিল্লির দিকে যাও, তাহলে প্রতি পদক্ষেপে পথচুম্বন করো।... প্রতিটি গলির সামনে থেমে দেওয়াল-দরজার দিকে আমার হয়ে নিরাশা ভরা দৃষ্টি দিয়ে যেয়ো। প্রতিটি বিপদগ্রস্ত মানুষকে আমার হয়ে সমবেদনা জানিয়ে যেতে ভুলো না। প্রতিটি দেওয়ালের নীচে থেমে ফরিয়াদ করে যেয়ো। (অনুবাদ : জাভেদ হুসেন)

মীর তকি মীর যখন লক্ষ্ণৌয়ে হতাশ হয়ে বলছেন, আমার কবিতা কি আপনারা বুঝবেন?

লক্ষ্ণৌ উত্তর দিচ্ছে— সারা হিন্দুস্তান গর্ব করে লক্ষ্ণৌয়ের শায়েরি আর গজল নিয়ে। আমরা ফারসি ভাষার জটিলতম কবি আনওয়ারি, খাকানির কবিতা বুঝি, আপনার কবিতা বুঝব না?

মীরের জবাব, ওই কবিদের জন্য বড়ো বড়ো অভিধান, কোষগ্রন্থ জরুরি। আমার কবিতার একমাত্র অভিধান দিল্লির অলিগলি আর জামে মসজিদের সিঁড়ি। আপনারা তো এগুলো থেকে বঞ্চিত।

(মীর থেকে মীর, গজল থেকে: জাভেদ হুসেন, পৃ.-২১)

উত্তর-পূর্ব দিল্লি জ্বালিয়েছেন নয়া নাদির শাহ অমিত শাহ—নরেন্দ্র মোদীর চ্যালারা— কপিল শর্মা, প্রবেশরা। ২৪, ২৫, ২৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লি জ্বালানো হয়েছে। পুলিশ কোথাও নিষ্ক্রিয়, কোথাও সরাসরি অংশ নিয়েছে গণহত্যায়। সরকার, প্রশাসন, পুলিশ জঘন্য গণহত্যার অপরাধে অপরাধী। সেনাকে ডাকা হয়নি। তারাও চুপ। দিল্লির নাগরিক সমাজের এক অংশ কিন্তু নীরব থাকেননি। তাঁরা ২৫ ফেব্রুয়ারি মাঝরাতে দিল্লি হাইকোর্টের কড়া নেড়েছেন। প্রধান বিচারপতির নির্দেশে বিচারপতি মুরলীধর, দিল্লি পুলিশকে শান্তি ফেরাতে নির্দেশ দিয়েছেন। গণহত্যার উশকানিদাতা কপিল শর্মা, প্রবেশদের ভিডিও শুনিয়ে, তাদের উশকানিমূলক কথাবার্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। ফল পরদিন ২৬ ফেব্রুয়ারির মাঝরাতে তাঁর বদলির আদেশ। রাষ্ট্রপতি নজিরবিহীনভাবে সই করলেন। রাতারাতি বদলি।

কিন্তু সবাই তা মানেননি। তার প্রমাণ, মুরলীধরের বিদায় সংবর্ধনায় নজিরবিহীনভাবে গাওয়া হয় গান— যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে— সারিবদ্ধভাবে ভিড় করে থাকেন আইনজীবীরা। বলেন, আপনিই প্রেরণা।

২৬ ফেব্রুয়ারি যখন মহল্লা পুড়ছে, সাত সাতজন প্রতিবেশীকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে পুড়ে গেছেন প্রেমকান্ত বাঘেল। বাঘেল পুড়েছেন, কিন্তু আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন অনেক মানবিক মনে।

দিল্লির অশোক বিহারে এক মসজিদে আগুন লাগিয়ে মসজিদের মিনার থেকে ইসলামি সবুজ পতাকা খুলে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দিল্লি পুলিশ টুইট করে অস্বীকার করেছিল ঘটনা। দিল্লি পুলিশ মুখ পুড়িয়েছে বিশ্বের দরবারে। কিন্তু দিল্লির মুখ উজ্জ্বল করেছেন এক যুবক, যিনি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী, রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদে নয়। আবার মসজিদের মিনারে লাগিয়ে দিয়েছেন সবুজ পতাকা। খুলে ফেলেছেন হনুমানের ভাগোয়া ঝান্ডা।

নাম তাঁর রাম সিং। তিনি রাজনৈতিক রাম নন। মানবিক রাম। তিনি ও তাঁর পুত্র প্রাণ বাঁচিয়েছেন তাঁর ভাড়াটিয়ার। ভাড়াটিয়া জন্মসূত্রে মুসলিম। তিনি নিজের ঘর ভাড়া দিতে কুণ্ঠিত হননি। আবার প্রাণ বাঁচাতে ভয়ে পিঠটান দেননি। গণহত্যাকারীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছেন, আমাদের না মেরে তোমরা উপরে যেতে পারবে না। আবার, অনতিদূরে মুসলমান প্রতিবেশীরা আক্রমণকারী ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে রক্ষা করেছেন শিব মন্দির। সেই সময় কোনো হিন্দু সেই স্থানে ছিলেন না। তবু রক্ষিত হয় মন্দির। সহজ মানুষের সহজ প্রতিরোধেই বেঁচে থাকে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা।

দিল্লিতে শাহিনবাগে লঙ্গরখানা চালাচ্ছেন, নিজের ফ্ল্যাট বেচে আইনজীবী আর এস বিন্দ্রা। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন শত শত শিখ। অনেকেই এসেছেন পাঞ্জাব থেকে ট্রাকে করে।

১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে মুসলিমদের সঙ্গে দাঙ্গা বেধেছিল। পাকিস্তানে শিখ হত্যার বদলা নিয়েছিল শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশের বিপথগামী উন্মত্ত লোক।

২০২০-এর গণহত্যায় সমগ্র শিখ সমাজের ভূমিকা সম্পূর্ণ বিপরীত। শিখরা সমস্ত গুরুদ্বার খুলে দিয়েছেন আশ্রয়প্রার্থী মানুষের জন্য। খ্রিস্টানরা খুলে দিয়েছেন চার্চ। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী সময় পাননি যাওয়ার কিন্তু 'প্রতিবেশী হিন্দুরা' গেছেন। শান্তি মিছিল বের করেছেন চাঁদবাগে ও অন্যত্র।

দিল্লিতে আশ্রয় শিবিরে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছেন বহু মানুষ যাঁরা জন্মসূত্রে হিন্দু। এ ঘটনা গুজরাটেও প্রত্যক্ষ করেছেন শিবিরে যাওয়া মানুষরা।

হর্ষ মান্দার সে সময় অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এখন দিল্লিতেও তিনি ও তাঁর সহযোগীরা।

যে সব সাংবাদিক দিল্লি গণহত্যার খবর করেছেন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, গুলিবিদ্ধ হয়ে, তাঁদের শতকরা ৯৯ ভাগ জন্মসূত্রে হিন্দু। কাউকে কাউকে প্যান্ট খুলে দেখাতে হয়, প্রমাণ করতে হয়েছে 'হিন্দু' বলে। কিন্তু কলমে, আলোকচিত্রে প্রমাণ করেছেন, মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

দিল্লিতে ২ জন পুলিশকর্মী খুন হয়েছেন। রতনলাল। তিনি ছিলেন শান্তির পক্ষে। গণহত্যাকারীরা ঘিরে ধরে তাঁকে খুন করেছে। তাঁর অপরাধ, কয়েকজন শিশুকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন। আরেকজন অঙ্কিত শর্মা। তাঁকে খুন করেছে রাজনৈতিক, ক্ষমতা ব্যবসায়ী হিন্দুত্ববাদীরা।

অঙ্কিত শর্মা যখন গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক হিসেবে খবর নিচ্ছিলেন তখন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে তাঁকে খুন করে নর্দমায় ফেলে দেয়। এমন অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁর ভাই। যখন ঘিরে ধরেছে উন্মত্ত খুনিরা, তখন ফোনে কথা বলছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। সেই ছিল তাঁর শেষ ফোন। যারাই খুন করে থাকুক, তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। যেমন হওয়া উচিত ফায়জানের মৃত্যুর জন্য দায়ী দিল্লি পুলিশ কর্মীদের যারা আহত ফায়জানকে খুঁচিয়ে জাতীয় সংগীত গাইতে বাধ্য করছিল।

আপ কাউন্সিলার তাহির হোসেন ২৪ ফেব্রুয়ারি রাতেই বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন পুলিশের সাহায্যে। তাঁর কারখানা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সেখানে কাজ করতেন 'হিন্দু' সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ। এলাকায় মন্দির সংস্কারে ও উন্নয়নে কাজ করেছেন তাহির হোসেন। এলাকার মানুষ বলেছেন, তাহির হোসেন আক্রান্ত। দিল্লি পুলিশের এক সহকারী কমিশনার প্রথমে বলেছিলেন, তাহির হোসেন আক্রান্ত। তাঁকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর জনসংযোগ আধিকারিক দিল্লির পুলিশমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশে বলছেন, ভিন্ন বয়ান। প্রসঙ্গত, দিল্লি পুলিশের দায়িত্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি একটি বাক্যও খরচ করেননি, দিল্লি গণহত্যা নিয়ে। বরং তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশে আক্রান্তদেরই মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে পুলিশ। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এমন অমানবিক, যিনি, শিখর ধবন নামে এক ক্রিকেটার আঙুলে চোট পেলেও টুইট করেন, ৫৩টি লাশ সরকারিভাবে উদ্ধার হওয়ার পরও নিন্দা করার অবসর পাননি।

কিন্তু শাসকরাই তো শেষ কথা নয়। শেষ কথা বলে জনগণ। যাঁরা মৈত্রী, সম্প্রীতি ও সংহতি চান। ইয়েস ব্যাঙ্ক নো হলে কষ্ট পান। কষ্ট পান মানুষের মৃত্যুতেও। তাই মনে করতে হয় মীর তকি মীরের কবিতা—

দিল ও দিল্লি দোনো আগর খারাব হ্যায়
পর কুছ লুতফ ইস উজড়ে ঘর মে ভি হ্যায়।
(হৃদয় ও দিল্লি যদিও দুটোই নষ্ট হয়েছে
তবু এই উজাড় ঘরেও কেমন শান্তি।)

সমসাময়িক

করোনা আক্রান্ত বিশ্ববাজার

করোনা ভাইরাস বা SARS-CoV-2 আয়তনে এতই ছোটো যে তাকে দেখতে হলে শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ছাড়া গতি নেই। অথচ করোনা ভাইরাস নামটি এখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মানুষ শুনে ফেলেছেন, ১ লক্ষ ১৩ হাজার মানুষ এর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, মৃতের সংখ্যা ৪০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে, শতাধিক দেশে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে (আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার ১০ মার্চ প্রেস বিবৃতি)। এই সংখ্যাগুলি কোথায় গিয়ে থামবে জানা নেই, তবে আশার কথা যে নতুন রোগীর সংখ্যা, বিশেষ করে চিনে, উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবু মানুষের উদ্বেগ বেড়ে চলেছে, অজানা রোগের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন পৃথিবীর বহুলাংশের মানুষ।

মানুষের প্রাণের থেকে দামি কিছু হতে পারে না। করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করার এক এবং একমাত্র লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচানো। তার জন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা নিতে হবে। দুঃখের হলেও সত্যি যে করোনা শুধু মানুষকে প্রাণে মেরে থামছে না, এই ভাইরাসের প্রকোপে স্তব্ধ হয়ে যেতে বসেছে বিশ্ব অর্থব্যবস্থা। শুরু করা যাক চিন থেকে। চিনে করোনা প্রথম ধরা পড়ে এবং অধিকাংশ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত রোগী চিন দেশে বসবাসকারী। করোনার মোকাবিলা করার জন্য চিন প্রচুর পদক্ষেপ ঘোষণা করে। ইউহান শহর তথা জেলাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্রুত হাসপাতাল এবং সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য রোগীদের বিচ্ছিন্ন রাখার স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলা হয়। হাজারও ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের সরকার নিয়োগ করে এই রোগ মোকাবিলা করতে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন চিন যে দ্রুততার সঙ্গে করোনার বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নামে তার জন্য পৃথিবীর বাকি মানুষ অতিরিক্ত সময় এবং জ্ঞান অর্জন করেন এই রোগের মোকাবিলা করতে। সমস্ত জায়গায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করে চিন নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যাতে এই মারণ ভাইরাস চিনের সীমা অতিক্রম করে অন্য দেশে না যেতে পারে। চিন পদক্ষেপগুলি যে দ্রুততা এবং দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর করেছে তার জন্য মানবজাতির চিনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, অভিমত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞের।

কিন্তু এই পদক্ষেপ চিনের অর্থব্যবস্থার প্রভূত ক্ষতি করে দিয়েছে। চিন একটি উন্মুক্ত বাণিজ্যের রপ্তানি নির্ভর দেশ। ভাইরাসের প্রকোপে চিনের রপ্তানি বাণিজ্য স্তব্ধ হয়ে যেতে বসেছে। ভাইরাস যাতে না ছড়ায় তার জন্য চিন থেকে কোনো জিনিস আমদানি করতে ভয় পাচ্ছে গোটা বিশ্ব। তদুপরি, চিনের পরিবহণ ব্যবস্থার উপরেও বিধিনিষেধ লাগানো হয়েছে যাতে মানুষ যথেচ্ছ ভ্রমণ করে সংক্রমণ না বাড়াতে পারে। অতএব পুঁজি ও মানুষের চলাচল প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। পুঁজি যদি অচল থাকে, মানুষ যদি অচল হয়ে পড়ে তবে অর্থব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। অতএব চিনের অর্থব্যবস্থা খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অর্থব্যবস্থা নির্দিষ্টভাবে ঠিক কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার অনুমান করা মুশকিল। আপাতত OECD বা পৃথিবীর উন্নত দেশের একটি সংস্থা জানাচ্ছে ২০২০ সালে চিনের আর্থিক বৃদ্ধির হার হবে ৫ শতাংশ যা বিগত ত্রিশ বছরে সর্বনিম্ন।

চিনের মতন দেশের বৃদ্ধির হার যদি এতটা কমে আসে তবে স্বাভাবিকভাবেই গোটা দুনিয়ায় তার প্রভাব পড়বে। এর দুটি কারণ রয়েছে। প্রথম করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ফলে সার্বিকভাবেই পণ্য, পুঁজি ও মানুষের অবাধ গতিবিধি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বাণিজ্য কমে গেছে, বিনিয়োগ কমেছে। এর ফলে সরাসরি বিশ্ব অর্থব্যবস্থার বৃদ্ধির হার কমে ২০২০ সালে মাত্র ২.৪ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আবার মনে রাখতে হবে যে করোনা ভাইরাস হওয়ার আগে বিশ্ব অর্থব্যবস্থার হাল খুব ভালো ছিল না। চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধ, ২০০৮-এর সংকট পরবর্তী আর্থিক ঝিমুনি, ব্রেক্সিট সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা ও আরো বিবিধ কারণে বিশ্ব অর্থব্যবস্থার বৃদ্ধির হার নীচের দিকেই ছিল। করোনা এই ধুঁকতে থাকা অর্থব্যবস্থার উপরে আরো একটি অপ্রত্যাশিত এবং বড়ো আঘাত হেনেছে। এই আঘাত বিশ্ব অর্থব্যবস্থার কতটা ক্ষতি করবে, অর্থব্যবস্থা এই আঘাতের থেকে ঘুরে দাঁড়াতে কত সময় নেবে তা আগাম বলা সম্ভব নয়, কারণ করোনার ব্যাপ্তি নিয়েই অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই ভাইরাস যদি দীর্ঘমেয়াদে টিকে যায় এবং মানুষের

ক্ষতি লাগাতার করতে থাকে তবে অর্থব্যবস্থা গভীর সংকটে নিমগ্ন হবে এই কথা হলপ করে বলা যায়।

অন্যদিকে, শেয়ার বাজার এবং খনিজ তেলের বাজারে ধ্বস নেমেছে বলা যেতে পারে। ৯ মার্চ ২০২০ তারিখে বিশ্ব শেয়ার বাজারে এক ঐতিহাসিক পতন দেখা যায়। ভারতের বম্বে শেয়ার বাজারে সেনসেক্স প্রায় ২০০০ পয়েন্ট পড়ে যায়, যা বিগত ৩০ বছরে সর্বাধিক পতন। আবার নিউ ইয়র্কের শেয়ার বাজার, জাপানের শেয়ার বাজারেও ব্যাপক পতন হয়। গোটা বিশ্বব্যবস্থা যেখানে সংকটাপন্ন এবং একের পর এক দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে সেখানে বিশ্ববাজারের বিনিয়োগকারীরা মনে করছেন যে শেয়ার বাজারে টাকা খাটালে অনিশ্চয়তা বাড়বে। তাই তাদের একটা বড়ো অংশ বিশ্বের শেয়ার বাজার থেকে অর্থ তুলে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণপত্র (treasury bill)-এ বিনিয়োগ করছে। এই ঋণপত্রের সুদের হার যৎসামান্য। কিন্তু অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা অনেক বেশি। বিনিয়োগকারীরা করোনার ছায়ায় আর বাড়তি ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। তা যদি হয় তবে নিকট ভবিষ্যতে বিশ্ব বাজারে বিনিয়োগ বাড়ারও সম্ভাবনা কম থাকবে। সুতরাং আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

করোনা ভাইরাসের প্রকোপে ২০০৯ সালের পর প্রথমবার বিশ্বে তেলের চাহিদা কমেছে প্রতিদিন ৯০০০০ ব্যারেল। খনিজ তেলের চাহিদার পতন আবারও প্রমাণ করছে যে বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় মন্দার ছায়া দেখা দিয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে সৌদি আরব এবং রাশিয়ার মধ্যে তেলের দামকে কেন্দ্র করে বিতণ্ডা শুরু হয়েছে। চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে তেলের দামও কমে গেছে। এই পরিস্থিতিতে সৌদি আরব চেয়েছিল খনিজ তেল সরবরাহকারী দেশগুলি তেলের উৎপাদন কমাক যাতে তেলের দাম আবার বাড়তে পারে। কিন্তু বিগত তিন বছরে বাকিরা উৎপাদন কমালেও রাশিয়া তা করেনি বলে অভিযোগ। ফলত, রাশিয়া বাড়তি উৎপাদন এবং তেলের বর্ধিত দাম দুইয়ের সুযোগ গ্রহণ করেছে। এবারেও তারা উৎপাদন কমাতে রাজি নয়। সৌদি আরব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা রাশিয়াকে উচিত শিক্ষা দেবে। তাই তারা উৎপাদন বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে তেলের দাম এক ধাক্কায় ৩০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। এই দুইয়ের অভিঘাতে আন্তর্জাতিক খনিজ তেলের বাজারে দাম তলানিতে এসে ঠেকেছে। ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭০ ডলার যা ৯ মার্চে হয়েছে মাত্র ৩৭ ডলার। তেলের দাম কমলে নিশ্চিতভাবে উপভোক্তাদের বিশেষ করে সেই সব দেশের যারা তেল আমদানি করে তাদের লাভ হবে। কিন্তু সার্বিকভাবে তেলের দাম কমতে থাকলে খনিজ তেল রপ্তানিকারী দেশগুলির আয় কমবে। মন্দাবস্থা, সৌদি-রাশিয়া দ্বন্দ্ব এবং কমতে থাকা তেলের দামের প্রভাব বিশ্ব অর্থব্যবস্থার সংকটেরই বিভিন্ন রূপ।

যত দোষ করোনা-ঘোষ ভাবার অবশ্য কোনো কারণ নেই। আমরা আগেই বলেছি করোনা-র প্রকোপ শুরু হওয়ার আগেও বিশ্ব অর্থব্যবস্থার হাল প্রায় বেহাল ছিল। করোনা সেখানে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে অর্থনৈতিক মন্দাকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু আসল সংকট রয়ে গেছে বিশ্ব পুঁজিবাদের জঠরে। বিশ্বায়নের মাধ্যমে সবার উন্নতি হবে বলে পুঁজিবাদীদের যেই প্রতিশ্রুতি ছিল তা ভঙ্গ হয়েছে। আর্থিক বৈষম্য মাত্রাছাড়া হয়ে গেছে। অন্যদিকে, আর্থিক পুঁজি নির্ভর অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আর ঘটছে না। ২০০৮ সালের বিশ্ব আর্থিক সংকট বুঝিয়ে দিয়েছে শুধুমাত্র শেয়ার বাজার কেন্দ্রিক ফাটকা নির্ভর আর্থিক বৃদ্ধি ক্ষণস্থায়ী হয় এবং সংকট ডেকে আনে। কিন্তু আর্থিক পুঁজির শেকলে বাঁধা রাষ্ট্র নিজের বিনিয়োগ বাড়িয়ে অর্থব্যবস্থায় চাহিদার সংকটের মোকাবিলা করতে অপারগ। কারণ রাষ্ট্র আর্থিক পুঁজির তৈরি করা অনুশাসনের বাইরে যেতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজার গভীর সংকটের সামনে দাঁড়িয়েই ছিল। করোনা ভাইরাস এই শক্তিহীন নির্বল অর্থব্যবস্থার শরীরে জাঁকিয়ে থাবা বসানোর সুযোগ পেয়েছে। যেমন মরণাপন্ন রোগী বা দুর্বল রোগীকে করোনা সহজে কাবু করতে পারে, তেমনি দুর্বল বিশ্ব অর্থব্যবস্থাকে কাবু করেছে করোনা। রোগী সুস্থ হবে নাকি তার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটবে, এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

সুবিধেবাদই তা হলে মুখ্য?

মধ্যপ্রদেশের কমলনাথ সরকারের সংকট, এই প্রতিবেদন লেখার মুহূর্তে, প্রবল। তাঁর মন্ত্রীসভার ১২ জন মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন ৯ মার্চ মধ্যরাতে। এমন পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের একটা বড়ো অংশ বিদ্রোহী নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার দিকে ঝুঁকে গিয়ে তাঁরা বিজেপি শিবিরের পক্ষে যেতে চলেছেন বলে জল্পনা। এর মধ্যেই ১৯ জন বিধায়ক কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। মনে করা হচ্ছে এঁদের মধ্যে অন্তত ১৬ জন বিধায়ক এই মুহূর্তে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে রয়েছেন। আর তাঁরাই বাঙ্গালোরে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপালকে ছয়জন মন্ত্রীকে অবিলম্বে অপসারণের সুপারিশ করেছেন। এর আগে কংগ্রেস শিবিরের বিধায়কদের ঘরে ফেরাতে মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন

কমলনাথ। বিদ্রোহী বিধায়করা, এমনকী সিন্ধিয়ার কাছেও বার্তাবাহক পঠিয়েছিলেন তিনি। যেখানে ফের একবার কংগ্রেস শিবিরে যোগ দেওয়ার বার্তা স্পষ্ট করা হয়েছিল। সিন্ধিয়া শিবির যাতে কংগ্রেসের হাতছাড়া না হয়, তার জন্য কমলনাথ সিন্ধিয়া ঘনিষ্ঠদের কাছে একের পর এক অফার রেখেছিলেন। এমনকী নিজের মন্ত্রীসভায় সিন্ধিয়া ঘনিষ্ঠদের যোগ দেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছিলেন। কীভাবে কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশ সরকারকে পতনের হাত থেকে বাঁচাবে, তা নিয়ে দিগ্বিজয় সিং-এর সঙ্গেও কথা বলেন। কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে, বিজেপি-র সঙ্গে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার যোগাযোগ স্পষ্ট, এবং এই প্রতিবেদন লেখার সময়েই তিনি সরাসরি বিজেপি-তে যোগদান করেছেন। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পরেই কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন জ্যোতিরাদিত্য। বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার পরেই জ্যোতিরাদিত্যকে রাজ্যসভার আসন দেওয়া হয়েছে। দেশ ও রাজ্যের মানুষের সেবা নাকি করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দলে থেকে তা করা সম্ভব হচ্ছিল না। দল থেকে ইস্তফা দিয়ে এভাবেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। যদিও তাঁর বিদ্রোহটা আসলে কমলনাথের বিরুদ্ধে নয়। এই বিদ্রোহ ১০ জনপথের বিরুদ্ধে, বিজেপি-র পক্ষে এবং নিজের আখের গোছানোর লক্ষ্যে।

মধ্যপ্রদেশে জ্যোতিরাদিত্য বনাম কমলনাথের অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুদিনের। গত মাসেও দুই নেতার মধ্যে ঝামেলা প্রকাশ্যে আসে। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সরকার যখন সংকটে তখন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং বলেছিলেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তাঁর নাকি সোয়াইন ফ্লু হয়েছে। কিন্তু হোলির সকালেই দেখা যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে দেখা করতে যান জ্যোতিরাদিত্য। তার পরেই কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে, ২৩০ আসনের মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেসের কমলনাথের হাতে এখন ১২০ বিধায়ক। ম্যাজিক ফিগার ১১৬-র চেয়ে মাত্র চারজন বেশি। এর মধ্যে কংগ্রেসের ১১৪ জন, বিএসপি-র দু জন, সমাজবাদী পার্টির একজন এবং অন্যরা নির্দলের। অন্যদিকে বিজেপি-র বিধায়ক সংখ্যা ১০৭। দুটি আসন খালি রয়েছে। সেই হিসেবে ম্যাজিক ফিগার ১১৫। এই ১৬ বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিলে পদ্ম শিবিরের পক্ষে সরকার গঠনে অসুবিধা হবে না। কার্যত কর্নাটকের কায়দায় মধ্যপ্রদেশের ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

গত দুই বছর ধরেই সিন্ধিয়ার রাজনৈতিক জীবন টালমাটাল চলছিল। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে ১৫ বছর পর মধ্যপ্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় কংগ্রেস, যে ফলাফলে যথেষ্ট অবদান ছিল সিন্ধিয়ার। মুখ্যমন্ত্রী হবার দৌড়েও এগিয়ে আসেন তিনি। কিন্তু তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদে সমর্থন করেন মাত্র ১৩ বিধায়ক। ফলে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়নি।

কমলনাথকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি রাখা হয়। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার ক্ষোভ কমিয়ে লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধির সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের দলের সাধারণ সম্পাদক করা হয়, তবে সে রাজ্যে দলের ভরাডুবি হয়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে নিজের কেন্দ্র গুণাতেও পরাজিত হন তিনি। অপরদিকে, গত কয়েকমাসে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসে তৈরি হয়েছে তিনটি পৃথক গোষ্ঠী। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, কমলনাথ এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং-এর বিভাজন এবং অন্তর্দ্বন্দ্বই এর কারণ। এদের মধ্যে সিন্ধিয়ার গোষ্ঠীটি সবথেকে দুর্বল ছিল বলে অতি সহজেই কোণঠাসা হয়ে পড়েন তিনি। পারিবারিকভাবে সিন্ধিয়ার পরিবারের সঙ্গে বিজেপি-র যোগাযোগ সুগভীর এবং সুপ্রাচীন। তাঁর ঠাকুমা বিজয়রাজে ছিলেন বিজেপি নেত্রী। বাবা মাধবরাও তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন জনসংঘের হাত ধরে। জ্যোতিরাদিত্যর দুই পিসিও বিজেপি-তেই আছেন। ফলে, বিজেপি-তে যোগ দিয়ে এক হিসেবে তাঁর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন হল। স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনও, বলাই বাহুল্য, যেহেতু এই ধরনের ক্ষমতালিপ্সা ও সুবিধেবাদী রাজনীতিতে বিজেপি কংগ্রেসের থেকে কোনো অংশে কম যায়নি কোনোকালেই।

প্রশ্নটা হল, এই যদি বিরোধীদের চেহারা ও চরিত্র হয়, কোন নৈতিকতার প্রশ্নে তারা বিজেপির বিরোধিতায় নামে? বিদ্রোহী বিধায়কদের চার্টার্ড প্লেন ভাড়া করে বাঙ্গালোর উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে হোটেলে লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে কারণ তাঁরা 'কুমির তোর জলকে নেমেছি' স্টাইলে একবার কংগ্রেসকে স্পর্শ করছেন তো একবার বিজেপি নামক সলিল-অভিযানের সওয়ারি হচ্ছেন। বিনিময় মূল্য হিসেবে যে মোটা অঙ্কের অর্থ এবং ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি খেলা করছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পুরোটাই দেওয়া নেওয়ার খেলা, যার মধ্যে বিজেপি-বিরোধিতার আদর্শের ন্যূনতমও নেই। বস্তুত, কংগ্রেসের বহু বিধায়কই অর্থের মূল্যে এর আগে বিজেপি-র কাছে বিক্রয় হয়ে গিয়েছেন। কংগ্রেসের বিজেপি বিরোধিতার মূলে কতটা ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য আছে তা নিয়ে সন্দেহ জাগে। দুই পার্টিই বৃহৎ পুঁজিপতি ও জমিদার-জোতদার শ্রেণির প্রতিনিধি, এবং এই দুইয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব মূলত ক্ষমতার ভাগবাঁটোয়ারা সংক্রান্ত। তাই যে পক্ষে ক্ষমতার ওজন বেশি, সেই পক্ষেই অপর দিক থেকে দলে দলে

প্রতিনিধিরা এসে যোগ দেন। এই পালটি খাওয়ায় আশ্চর্যের কিছু নেই। আশ্চর্যের হল, এখনও প্রগতিশীল শিবিরের একটা বড়ো অংশ কংগ্রেসের মধ্যে বিজেপি-বিরোধী প্রতিরোধের উপাদান খুঁজে পাবার মায়াস্বপ্নের আমেজে বিভোর হয়ে আছেন, এই ব্যাপারটা। হয়তো এটাও ভারতীয় গণতন্ত্রের বর্তমান অসহায়তার একটি দিক, যে যেভাবে বিজেপিকে বিরোধিতা করছে তাকেই আঁকড়ে ধরা।

আর এই আঁকড়ে ধরবার সূত্রেই কখনো হিরো হচ্ছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কখনো বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য জননায়কের আসন থেকে তাঁদের পতন ঘটতেও দেরি হচ্ছে না বিশেষ। কেজরিওয়াল ইতিমধ্যেই বিজেপি-র কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। দিল্লি দাঙ্গার সময়ে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির সমাধিতে কেজরিওয়ালের প্রার্থনা দেখে আজকাল হাসিও পায় না, করুণা হয়। অথচ এক মাস আগেই ভোটে জেতার পর তাঁকে নিয়ে উদারপন্থীদের নাচানাচি দেখে মনে হচ্ছিল যে এই বুঝি ধর্মনিরপেক্ষতার নতুন স্তম্ভ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। অপরদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি একবার বিজেপি-র বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়েন, পরমুহূর্তেই সারদা নারদা সিবিআই-এর জুজু দেখিয়ে সুড়সুড় করে হিন্দুত্ববাদীদের কোলে চড়ে বসেন। একদিকে তিনি নিজেকে সংখ্যালঘুদের মসিহা বলে দাবি করেন, অন্যদিকে তাঁর পুলিশ সিএএ-এনআরসি বিরোধী মিছিল বন্ধ করে দেয় সামান্য অজুহাতে। কেন্দ্রবিরোধী ধর্মঘট বানচাল করতে উঠে-পড়ে লাগে। এনপিআর স্থগিত করলেও সম্পূর্ণ বাতিল করতে তাঁর হাত কাঁপে। এই দোদুল্যমান অবস্থানও সুবিধেবাদিতার নামান্তর, যে রথে আপাতত ভারতের সিংহভাগ আঞ্চলিক দলগুলিই সওয়ার।

ভরসা রাখা যেত যে বামপন্থীদের উপর, তাঁরা হীনবল। সংগ্রামের ময়দানে তাঁরাই আগুয়ান, কিন্তু ভোটের লড়াইতে আপাতত দুর্বল। তাঁদের বাদ দিয়ে বাকি বিরোধী শিবিরের যা অবস্থা, এদের ভরসায় থেকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া অনেকটা জুডাস ইসক্যারিয়টের নেতৃত্বে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মতোই অলীক ও হাস্যকর শোনায়। শেষ বিচারে তাই এই সংগ্রামে যদি রাজনৈতিক দলগুলি এভাবে ব্যর্থ হয়, সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের মধ্য থেকেই উঠে আসবে আগামীর নতুন রাজনীতি, যে রাজনীতির স্টেশনের সান্টিং গ্রাউন্ডে সিন্ধিয়া অথবা শাহ নামধারীদের ট্রেনগুলি পড়ে থাকবে পরিত্যক্ত আবর্জনা হিসেবেই।

তালিবানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

একটুকরো সরকারি জমি। অনেকদিন ধরেই এ পাড়ার মাস্তানরা তার দখলদার। তারাই এই জমির ব্যাপারে শেষকথা। সেখানে বিয়েবাড়ির ম্যারাপ বাঁধা হবে না উচ্চস্বরে মাইক বাজিয়ে হনুমান জয়ন্তী পালন করা হবে, সবকিছুই তারা ঠিক করে। কোন উৎসবে স্থানীয় বাসিন্দাদের কত টাকা চাঁদা দিতে হবে তারাই ঠিক করে। পাড়ার বাসিন্দারাও এই অলিখিত হুকুমনামা নীরবে মেনে নিয়ে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। বেশ চলছিল। হঠাৎ করে অন্য পাড়া থেকে এক মাস্তানের আগমনে সবকিছু বদলে গেল। নবাগতদের দাবি এখন থেকে তারাই হবে এই মহল্লার সর্বেসর্বা। ব্যস, শুরু হয়ে গেল লড়াই। প্রতিদিনই বোমা পড়ে, গুলি চলে। কোনো পক্ষই অধিকার ছাড়তে রাজি নয়। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অবশেষে দুই পক্ষ স্থির করল ঢের হয়েছে, এবার থামা যাক। অনেক দূরের এক হোটেলে বসে দুই পক্ষ শান্তি চুক্তি করে মারামারি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল। জমির মালিক অর্থাৎ সরকার অথবা স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে জমির দায়দায়িত্ব তুলে দিয়ে বহিরাগত মাস্তানরা ধীরে ধীরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল। এমন ঘটনা পশ্চিমবাংলার মানুষের গা সওয়া হয়ে গেছে। প্রকাশ্যে উচ্চারণ না করলেও নিভৃত আলাপচারিতায় বলা হয়, গণতন্ত্রে এমনটা হয়েই থাকে।

আন্তর্জাতিক স্তরে দুই বিবাদমান ফৌজের মধ্যে এইরকম চুক্তি হলে তা কিন্তু আর অতটা সাদামাটা থাকে না। রীতিমতো চিন্তার বিষয় হয়ে যায়। অথচ আফগানিস্তান নিয়ে এমনটাই হল। ২০২০-র বিশেষ দিনে অর্থাৎ ২৯ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর তালিবানের মধ্যে এমন একটি শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হল। আফগানিস্তানে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয় শান্তি চুক্তির জন্য দুই পক্ষ দোহা-য় উপস্থিত হয়েছিল। আফগানিস্তান সরকারের কোনো প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তবে দর্শক হিসেবে অন্য বহু দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কাতারে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত।

তালিবানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি স্বাক্ষরের সময় সিদ্ধান্ত হল, আল কায়দার মতো জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না তালিবান। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান থেকে ১৪ মাসের মধ্যে সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করে নেবে। সব ঠিক থাকলে এর পরে কথা শুরু হবে

আফগান সরকারের সঙ্গে তালিবানের। এই প্রথম তালিবানকে কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

আঠেরো বছর ধরে চলা সংঘাতের অবসান হওয়ার প্রাথমিক ধাপ বলেই এই চুক্তিকে বর্ণনা করা হচ্ছে। ওয়াশিংটনের আফগান বিষয়ক প্রধান দূত এবং তালিবানের প্রাক্তন সেনাপতি এবং পরবর্তীকালে আলোচনাকারী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। ভারত সরকার বিবৃতি দিয়ে বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা লক্ষ করেছি সরকার-সহ আফগানিস্তানের গোটা রাজনৈতিক শিবির, সমাজ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই চুক্তির মাধ্যমে শান্তি এবং সুস্থিতি ফেরার সম্ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছে।' বাস্তবে আফগানিস্তান সরকারকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারতীয় বিবৃতিতে একই সঙ্গে আরো বলা হয়েছে, 'আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে এমন প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত কাবুলে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য সবরকম সহায়তা করবে।' অর্থাৎ পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের এলাকা হিসেবে তুলে ধরে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত রয়েছে বলে আবার জানান দেওয়া হল। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সঙ্গে আফগানিস্তানের সীমান্ত রয়েছে। প্রকারান্তরে কূটনৈতিকভাবে পাকিস্তান সম্পর্কে মার্কিন-তালিবান শান্তি চুক্তির দিনেই বিতর্কিত ভূখণ্ড নিয়ে নতুন করে বার্তা দেওয়ার কৌশল নেওয়া হল। তালিবান শাসনের অবসানের পর থেকেই যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের কাজে ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করে চলেছে। বস্তুত মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পরে আফগানিস্তানে আবার মৌলবাদের প্রভাব বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আফগানিস্তানে ভারতীয় সহযোগিতায় নির্মিত ও নির্মীয়মান প্রকল্পগুলির আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অমূলক নয়।

আফগানিস্তান সরকারের অনুপস্থিতিতে তালিবানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তির অনুষ্ঠানে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক নীতির পরিবর্তনের ফল। এর আগে তালিবানের সঙ্গে কোনো আন্তর্জাতিক মঞ্চে হাজির থাকতেন না কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি। পাকিস্তানের তরফে দোহায় হাজির ছিলেন সে দেশের বিদেশমন্ত্রী। তাঁর মতে পাকিস্তান আফগানিস্তানে শান্তি ফেরানোর চেষ্টায় নিজের কর্তব্য পালন করেছে। এখনও পাকিস্তানে অনেক আফগান শরণার্থী রয়েছেন। তাঁদের আফগানিস্তানে ফেরার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার জন্য বিশ্বের উদ্যোগী হওয়া উচিত। আর ওয়াশিংটন থেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন যদি তালিবান এবং আফগান সরকার তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করে তা হলে আফগানিস্তানে যুদ্ধ শেষ হওয়ার দিকে এগোনো যাবে।

দোহায় স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে,

- তালিবান শর্ত মানলে, ১৪ মাসের মধ্যে আমেরিকা ও ন্যাটো সহযোগীরা আফগানিস্তান থেকে সব সেনা সরিয়ে নেবে।
- ১৩৫ দিনের মধ্যে ৮৬০০ সেনা সরানো হবে।
- বন্দী বিনিময়ে সায়।
- ১০ মার্চের মধ্যে ৫,০০০ তালিবান সন্ত্রাসীকে ছাড়বে কাবুল। বিনিময়ে তালিবান ১০০০ আফগান সেনাকে ছাড়বে।
- ১৮ বছর পরে এবার হয়তো আফগানিস্তান সরকারের সঙ্গে এক টেবিলে বসবে তালিবান জঙ্গি গোষ্ঠী।

তবে দোহায় স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রের শর্ত মানা না হলে কী হবে তা কিন্তু বলা হয়নি। আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি এই চুক্তিকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করেছেন। আফগানিস্তান সরকার পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে তারা এই চুক্তির অংশীদার নয়। তালিবান সন্ত্রাসীদের মুক্তি দিতে আফগানিস্তান সম্মত নয়। তালিবানও কি চুক্তি মেনে চলছে? আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের প্রায় প্রতিটিতেই নিয়মিত সন্ত্রাসী হামলা চলছে। প্রতিদিনই হতাহতের খবর আসছে। রাজধানী কাবুলে আক্রান্ত হয়েছেন দেশের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ও সমান্তরালভাবে শপথ নেওয়া রাষ্ট্রপতি। ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাসিস্টান্স ফোর্স অর্থাৎ আইস্যাফ এবং ন্যাটোর উর্দির আড়ালে প্রকৃত অর্থে মার্কিন বাহিনীর হানাও বন্ধ হয়নি। সবমিলিয়ে এত ঘটা করে দোহায় যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল তার কোনো শর্ত কোনো পক্ষই মানছে না। নিজের সৃষ্টি করা তালিবানের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখন আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনায় আফগানিস্তানের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ইরান ও রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক মোটেও ভালো নয়। এই পটভূমিতে আফগানিস্তানে নামে বা বেনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে আগ্রহী। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে দোহা চুক্তি কার্যকর করা না গেলে সব পক্ষই হয়তো আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। সবমিলিয়ে আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে।

সেই প্রেক্ষাপটে দোহা চুক্তি অনুষ্ঠানে ভারতের উপস্থিতি তালিবানের মৌলবাদী ও সন্ত্রাসের নীতিকে নৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে দিল। ভারতের প্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক নীতি থেকে সরে এসে নতুন অবস্থান ঘোষণা করার সময় দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কিঞ্চিৎ ভাবনা চিন্তার অবকাশ ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাপটে ইতিমধ্যেই ইরান থেকে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে। ভারতের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে ইরান ধাপে ধাপে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে চলেছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের তরফে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও দিল্লি দাঙ্গা প্রসঙ্গে তিক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। আগামী দিনে এর প্রভাবে চাবাহার বন্দর প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হলে তার প্রতিক্রিয়া সহ্য করার মতো অবস্থা কি ভারতের আছে? ভারতীয় উদ্যোগে এবং সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের বিনিয়োগে গত এক দশক ধরে ইরানে গড়ে উঠছে চাবাহার বন্দর। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানকে এড়িয়ে সরাসরি ইরান থেকে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি করার জন্য এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে গিয়ে প্রথমে ইরান থেকে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি বন্ধ করে দেওয়া আর তারপরই তালিবানকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের লগ্নে উপস্থিত থেকে যেসব বিবৃতি দেওয়া হল তার প্রতিক্রিয়ায় ইরানের বিরাগভাজন হওয়া যুক্তিযুক্ত হল কিনা সে বিষয়ে সরকারের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। এমনকী সংসদের অধিবেশনেও বিষয়টি উচ্চারিত হয়নি। দোহা চুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ভারতের বর্তমান সরকার আবারও বুঝিয়ে দিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য মৌলবাদকে মদত দিতে আপত্তি নেই। এবং এটাই স্বাভাবিক। চূড়ান্ত বিচারে রং ভিন্ন হলেও মৌলবাদীদের লক্ষ্য একই থেকে যায়।

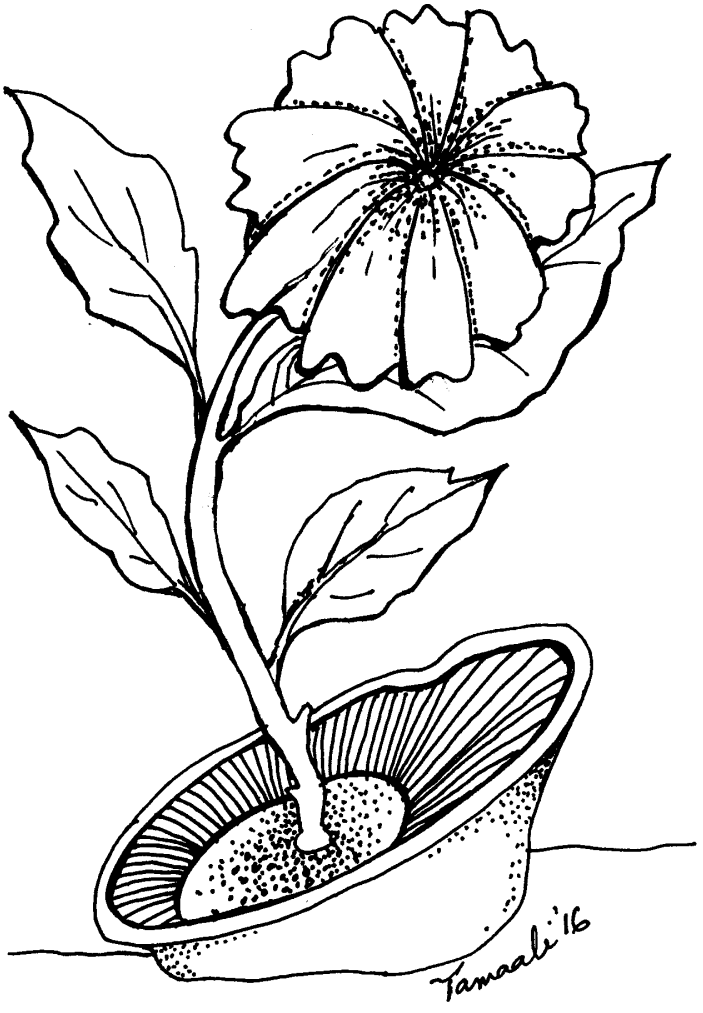

নাগরিকত্বের নাগপাশে ভারতের উদ্বাস্তু সমাজ

নীতীশ বিশ্বাস

অসম দিয়ে শুরু

বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেবার ঢালাও প্রতিশ্রুতিতে, ঝেড়ে বাঙালি ভোট পেয়ে, অসমে বিজেপি শাসক দলে পরিণত হল বিগত নির্বাচনে। পরে ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর নাগরিকপঞ্জির প্রথম খসড়া তালিকা প্রকাশিত হল। ৪০ লক্ষ বেনাগরিক ঘোষিত হল। যার অধিকাংশ বাঙালি। তখনও এ রাজ্যের অধিকাংশ আমরা সুদ্ধ এনআরসি চেয়েছিলাম। পরে দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশিত হবার পর এ রাজ্যের বাঙালি বাবুদের এ প্রসঙ্গে ঘুম একটু যেন ভাঙল। কিন্তু করণীয় তখনও নির্ধারিত হয়নি। ডি ভোটার, ডিটেনশন ক্যাম্প, এনআরসি-র তালিকার বাইরে ফেলা, সব মিলিয়ে অসম হয়ে উঠল বাঙালির সস্তা মৃগয়া ক্ষেত্র। জ্বলন্ত জতুগৃহ। অসমের বাঙালিরা অভিভাবকহীন অসহায় যাত্রীর মতো রাত্রি জেগে ডুবে মরছে, যেন 'জানে না সন্তরণ'। তখনও কাউকে পাওয়া গেল না যাঁরা বলবেন, 'ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার'। পাওয়া গেল না— নজরুলের সে বেদনার্ত হাইদারি হাঁক।

খিলঞ্জিয়া তত্ত্ব

অসম আন্দোলনের বৈষম্যের আর একটা মাপকাঠি শাসকেরা ঠিক করেছিল সে হল মূল নিবাসী বা খিলঞ্জিয়া (O.I) আর অখিলঞ্জিয়া (N O I)। ওরা বললে যে অসমিয়ারা থাইল্যান্ড থেকে ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে এসেছে। তারাই আদিবাসীদের মতো অসমের মূল নিবাসী। বাঙালিরা বহিরাগত। কিন্তু প্রখ্যাত অসমিয়া ঐতিহাসিক হেরম্বচন্দ্র বড়োপূজারির মতে বাঙালিরা অসমে গিয়েছে ৫ম/৬ষ্ঠ শতকে। তারপরও বাঙালি থেকে গেল অমূলনিবাসী। আর তার ৬/৭শো বছর পরে এসে অহমরা হল খিলঞ্জিয়া বা মূলনিবাসী। কেবল এই ঘটনাই নয় অনেকেই জানেন ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রশাসনিক-কর বৃদ্ধির অজুহাতে অসমের মধ্যে ৯৯%-বাঙালি অঞ্চল কাছাড়, গোয়ালপাড়াসহ বেশ কিছু বাঙালি এলাকা ঢুকিয়ে নেয় অসমে। সঙ্গে সারা দেশের মতো অসমের কৃষি ও চা-বাগানের উন্নতি কল্পে বাঙালি মুসলিম ও আদিবাসী শ্রমিক আমদানি করার নীতিগ্রহণ করে। ফলে অসমিয়া জনসংখ্যা হয়ে পড়ে বাঙালির চেয়ে কম। বাঙালির প্রতি ঈর্ষাবশত এই আতঙ্কের সূত্রে আক্রমণের সামনে এসে যায় শান্তিপ্রিয় শ্রমশীল, গুণশীল বাঙালিরা। তাই নানা অজুহাতে দীর্ঘকাল ধরে অসমে বাঙালি নিধনযজ্ঞ চলে আসছে নির্বিবাদে।[১] অন্যদিকে চা-বাগানসহ নানা অন্যভাষী আদিবাসীরা সেইভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উন্নত নন বলে আজও তাঁরা আক্রমণের সামনে আসেননি। কিন্তু বাঙালি নিধন ও নির্যাতনে ভাটা নেই।

অসমের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার চক্রান্ত

অসমিয়ারা বাঙালির জন-প্রাধান্য রোধ করার চক্রান্তের অংশ হিসেবে সরকারি মদতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ১৯৫০ সালেই একসঙ্গে ২৫২টি বাংলা মাধ্যম স্কুলকে অসমিয়া মাধ্যম করে দেয়। এর ফলে বাংলাভাষীরা হাজারে হাজারে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হলেন। আর মুসলিম বাঙালিদেরকে তারা টোপ দিল ছেলেমেয়েদের অসমিয়া স্কুলে দিলে তাদের নতুন অসমিয়া বলা হবে আর অসম থেকে তাড়ানো হবে না। জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে একাংশ মুসলিম বাঙালিরা নিজেদের নব্য-অসমিয়া ঘোষণা করলেন। কিন্তু তার কয়েক বছর পরেই (১৯৭৮-৮০) অসমিয়া উগ্রবাদীরা সরকারি মদতে[২] মুখ্যত বাঙালি মুসলিমদের ব্যাপকভাবে হত্যা করল। যা নেলীর গণহত্যা নামে কুখ্যাত। এখানে স্মরণীয় এই রক্তাক্ত অন্ধকারেও অসমিয়া বাম ছাত্র যুব, কৃষক নেতারা দাঙ্গারোধে ব্যাপকভাবে অংশ নিয়ে প্রাণ বিসর্জন করে ইতিহাসের এক স্বর্ণীল অধ্যায় রচনা করে গেছেন। কিন্তু অসমে নানা কারণে এই প্রগতিশক্তি আজ আর তাদের যোগ্য ভূমিকা পালনের উপযুক্ত শক্তিতে নেই। ফলে আরএসএস-এর বিভাজনের রাজনীতি এখনও অসমে তীব্রভাবে কার্যকর। সেখানে একাংশ চাইছে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালির ঐক্য আর এক শ্রেণি চাইছে ধর্মীয় বিভাজন। এক্ষেত্রে হিন্দু মৌলবাদীরা শক্তিশালী হলেও মুসলিম

মৌলবাদীরাও এখানে সক্রিয়। এর বিপরীতে বাঙালি হিন্দু মুসলিম ও গণতান্ত্রিক শক্তির পুরোনো ঐক্যবাদী সামাজিক সংগঠনের নাম নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় সমিতি (CRPCC), যার বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য। অসমে বাঙালিদের ওপর এখন শুরু হয়েছে নবতর আক্রমণ। সারা দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন তীব্র হয়েছে বলে এই আক্রমণের গতি একটু শ্লথ কিন্তু গভীর চক্রান্তের স্তরগুলি প্রতি মুহূর্তে জটিলতর করা হচ্ছে। বিশেষ করে অসম চুক্তি (১৯৮৫)-র ৬নং ধারার মধ্যে নিহিত বিষাক্ত ও বিপজ্জনক চক্রান্ত। যেখানে লেখা আছে : 'Constitutional, legislative and administrative safeguards, as may be appropriate, shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people.' যার রূপায়ণে উদগ্রভাবে লেগেছে সোনওয়ালের বিজেপি সরকার। এই জটিল পরিস্থিতিতে আমাদের মনে হয়েছে অসমিয়া উগ্র জাত্যভিমান যেভাবে নানা রাজনৈতিক দল প্রশ্রয় দিচ্ছে, তাতে অসম নামের রাজ্য থেকে বাঙালি অঞ্চল বিভাজিত না হলে ওখানে বাঙালি নিধন বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব। কারণ এদের মুখ্য প্রশ্রয়দাতা হল আরএসএস-পরিবার।

২০০৩ সালের আইনি সংশোধনী

বিজেপি সরকার ২০০৩ সালে নাগরিক আইনের যে সংশোধনী পাশ করে তার দ্বারা ১৯৪৮-এর ১৯ জুলাইয়ের পর উপযুক্ত সরকারি কাগজপত্র ছাড়া ভারতে যে উদ্বাস্তুরা এসেছেন তাঁদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ঘোষণা করে ভারতের বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের আবেদনের অধিকার পর্যত বাজপেয়ী-আদবানীরা কেড়ে নেয়। ফলে ২০০৩-এর নাগরিক আইনের সংশোধনীতে সারা ভারতের শ্রমজীবী বাঙালি উদ্বাস্তুরা বেনাগরিক হয়ে পড়লেন। আজ অমিত শাহজি যে বলেন ৭০ বছর এদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি, একথার মুখ্য দায় তাদেরই। এমনকী ১৯৭১ বা ১৯৫২-র আগে আসা যেসব উদ্বাস্তুদের নানা স্থানে নানা অবহেলার কারণে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি ২০০৩-৪ এর এই আইনি সংশোধনী তাদের সর্বার্থে বেনাগরিক করে দিল। এখন ২০১৯-র নাগরিক আইন সংশোধনী যদি সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেয়, তা হলে কিন্তু এই উদ্বাস্তুরা আবার বেনাগরিক হয়ে যাবে। তবে হিন্দুরা এদেশে কেবল থাকতে পারবে। তাই ক্যা (CAA) বাতিলের দাবি জানানোর আগেই ২০০৩-এর এই ভয়ানক সংশোধনীও বাতিলের দাবি জানাতে হবে। নাহলে দলিত-দরিদ্র বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকপত্রের জন্য দরখাস্তের অধিকারও থাকবে না।

দেশ ভাগ ও বাঙালি উদ্বাস্তুদের নির্দয় নির্বাসন?

পাঠক মনে করুন ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে বিশাল ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ হয়েছিল, তার সামান্যও আমরা দেখিনি ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের সময়। এই প্রসঙ্গে আর এক-দুটি কথা বলা এখানে অবান্তর হবে না, যথা (ক) দেশ ভাগের সময় জনসংখ্যার ধর্মীয় যে ভিত্তিতে জেলাগুলিকে বিভাজন করা হয় তা সঠিকভাবে মানা হয়নি বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে তাই মুসলিম প্রধান নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এল ভারতে আর খুলনার তিন ভাগের দুই ভাগ হিন্দু নিয়েই গেল পাকিস্তানে। অন্যদিকে বেশ কিছু কায়স্থ ও শূদ্র-অঞ্চল গেল পাকিস্তানে আর ব্রাহ্মণ-প্রধান অধিকাংশ অঞ্চলই এল হিন্দুস্থানে।[৪] (খ) এ সবের পেছনে কাজ করেছে তৎকালীন শাসক শ্রেণির বর্ণবাদী চরিত্র। যার প্রতিবাদ সেদিন কিছুটা হলেও করেছিল বামপন্থীরা। যা তেমন কাজে লাগেনি। সে যাই হোক এই অবিচার বহন করেই সারা ভারতে মাতৃভাষা হারা বাঙালিরা দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণির শ্রমজীবী হয়ে নানা অত্যাচার আর অবিচার সহ্য করে নাগরিক অধিকার যথাযথভাবে না পেয়ে, জন্ম-অপরাধীর মতো বেঁচেছিলেন। তখন আমাদের রবীন্দ্রপ্রেমী বিশ্ববাঙালিরা এই দলিত বাঙালিদের ভাই ভাবতেও সংকোচ বোধ করত। তাদের কোনো বিপদের দিনে তাদের প্রতি কেউ কোনোভাবেই ফিরে তাকায়নি। আর কৌশল এমন ছিল যে তাদের কোনো একটি রাজ্যে বেশি সংখ্যক উদ্‌বাস্তু পাঠানো না হয়; যাতে তারা সেখানে একটা শক্তি হয়ে উঠতে পারে। তাই আন্দামানে কিছু বাঙালি উদ্বাস্তু বেশি চলে গিয়েছিল বলে এই বাংলার শাসকেরা সেখানে স্কুলগুলিকে এ রাজ্যের সিলেবাস পড়তে দিল না। বাংলা বই দিল না। সেখানের কলেজগুলি আজও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। ২০০৩-এর নাগরিক আইনের সংশোধনী তাঁদের বড়ো অংশকে আবার বেনাগরিক করে দিল। বাংলাভাষী মানে বাংলাদেশি বলে বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাদের গরু-বাছুরের মতো বর্ডারের ওপারে নোম্যান্স-ল্যান্ডে ফেলে আসা হতে থাকল। এই ভয়ানক ট্রাজেডি ভারতের অন্য কোনো ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে হয়নি।[৫] এসব ঘটনা কলকাতার বনেদি সাংবাদিকদের সংবেদনশীল মনে রেখাপাতেও বিফল হয়েছে। তাই সাধারণ মানুষ তেমন জানতেও পারেনি তাই তাদের বিষয়ে এ বাংলায় আজও টুঁশব্দটি নেই। এই ফাঁকে ঘন দক্ষিণপন্থা তাদের মধ্যে গেঁড়ে বসেছে। আসলে বনেদি বাঙালির আত্মজন-উপেক্ষার এই হচ্ছে পরিণতি। তাই ভারতে বাঙালি হচ্ছে আজ আত্মদীর্ণ এক দুর্বল জাতি। যে আগুন আজ আপনার রান্নাঘরেও কান্নার রোল উতরোল সৃষ্টি করল বলে। কারণ যুদ্ধটা আজ বাঙালি বনাম বিজেপি।

বিজেপি-রা কী চায়?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে হিটলার জার্মানির ইহুদিদের মূল শত্রু ঘোষণা করে আর্য রক্তের বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল। ভারতে ব্রিটিশের বন্ধু হিসেবে ১৯২৫শে এই ফ্যাসিস্ত শক্তির বীজ রোপিত হয়েছিল। সেই আরএসএস-এর সন্তান দল আজ ভারত দখল করেছে। মোদী সরকারের স্পিকার এই উন্নত প্রযুক্তির যুগেও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিজ্ঞানবিরোধী কথা নির্লজ্জের মতো উচ্চারণ করেন। আর মোদী দিচ্ছেন গণেশের মাথার উন্নত শল্য চিকিৎসার দৃষ্টান্ত। এইসব জড়িয়ে এ দেশের ইতিহাস বেয়ে নানা ঘটনার যে আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফ্যাসিস্তদের শত্রু কেবল প্রগতিশীল মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীরাই নন, দেশভাগের আর এক উপাদান বাঙালিও তার এক বড়ো শত্রু। তাই সকলেই জানেন ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে এই শাসকগোষ্ঠীর চোখে পাকিস্তানই মূল শত্রু, সেই পাকিস্তান সংশ্লিষ্ট অঞ্চল তথা গুজরাট থেকে হরিয়ানা-পাঞ্জাব নয় তারা প্রথম এনআরসি শুরু করল বাঙালি সংখ্যাধিক্যের রাজ্য অসমে। আর সারা দেশে স্লোগান হাঁকল বাংলাভাষী মানেই বাংলাদেশি। এর পেছনের কারণ হল বিপ্লবী বাংলাকে দুর্বল করে রাখার দীর্ঘ প্রলম্বিত চক্রান্ত। কারণ বাংলার নবজাগরণ ভারতকে আলো ছড়িয়েছিল। তার বিপ্লবীরা স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক হারে প্রাণ দেন। তাই ১৯১২-তে রাজধানী দিল্লি চলে গেল, তাই কলকাতা পশ্চিমাদের কাছে মিছিল নগরী, তাই ১৯৮৫ সালে অসম চুক্তি হল অসমিয়া উগ্র-জাত্যাভিমানকে হাওয়া দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে, বাঙালির বিরুদ্ধে এই দাঙ্গাবাজদের চাগিয়ে দিতে। তারই অনুসঙ্গে ২০০৩-এর নাগরিক আইনে ঢুকল এই এনআরসি (NRC), 6A ধারা-সহ আরো নানা স্বৈরাচারী বিভিন্ন ধারা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহেরা বলেন বাঙালি ঘুসপেটিয়া হল উইপোকা তাদের কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে দাও। হিটলার যেমন ইহুদিদের বলত ইঁদুর। যাদের মারতে আমাদের সামাজিক মন সংকুচিত হয় না।

ক্যা (CAA) নিয়ে একটু আগে পরের ভাবনা

আমরা যারা No ক্যা (CAA), No NPR, No NRC বলছি, ঠিকই বলছি কিন্তু পিলসুজের নীচের অন্ধকার কীভাবে মোচন করা যাবে তা ভাবছি কি? তা যদি সঠিকভাবে আমরা না ভাবি, তা হলে এইসব ফাঁক ফোকর দিয়ে মানুষ যদি বিভ্রান্ত হন তখন আমাদের কী উত্তর হবে তাও ভাবতে হবে। আমরা তো চোখবুজে সব বাঙালি উদ্‌বাস্তুদের ফ্যাসিস্তদের দিকে ঠেলে দিতে পারি না। তাই বলে এটা সহজ ও অতি সরলীকৃত সিদ্ধান্ত হবে যে আমরা কি তা হলে কোনো প্রশ্ন না করে ক্যা (CAA) মেনে নেব? নিশ্চয়ই নয়। কারণ নাগরিক আইনের তথা আমাদের পবিত্র সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র এর দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হবে। যা কোনো গণতান্ত্রিক মানুষ মানতে পারেন না। আমরাও পারি না। শুধু তাই-ই নয় নাগরিক আইনের এই নয়া সংশোধনীতে যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে সেসব কাগজপত্র গরিব উদ্বাস্তুরা সংগ্রহ করবেন কীভাবে— সেটাও এক বড়ো প্রশ্ন। কে তাদের এনে দেবে বাংলাদেশের ধর্মীয় নির্যাতনে চলে আসার সার্টিফিকেট? কীভাবে তারা জোগাড় করবেন ধর্মীয় পরিচয়পত্র? আর যে মতুয়াদের একাংশ মনুবাদ বিরোধী হরিচাঁদের দার্শনিক ও ধর্মীয় আনুগত্যে তথাকথিত হিন্দুধর্ম মানেন না। যারা আম্বেদকর অনুগামী, যে ড. আম্বেদকর ১৯২৭ সালে এই মনুসংহিতা দাহ করে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধতা করেছিলেন, সেই হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ, আম্বেদকর-পেরিয়ারের অনুগামীরা কেন হিন্দুত্বের তিলক পরে নতুন করে হাজার বছর আগের সামন্ত বিশ্বাসের কাছে মাথা মুণ্ডন করতে যাবেন। এ হল জোর করে হিন্দুধর্মের বেষ্টনীতে এই লোকায়ত ধর্মের মানুষদের ঠেলে নেওয়ার অপকৌশল।

এদেশে কবে এসেছেন তার প্রমাণপত্রই বা তাঁরা পাবেন কোথায়? আদিবাসী, অরণ্যবাসীসহ দলিত-দরিদ্র ভূমিহীন মানুষেরা এতসব যন্ত্রণার রক্তনথি কোথা থেকে কীভাবে জোগাড় করবেন? আর এই আইনে কোথাও নাগরিকত্ব প্রদানের পরিষ্কার কোনো কথাই নেই। আছে শর্ত সাপেক্ষ আবেদনের যোগ্য হবার কথা। আছে নিজেকে বাংলাদেশি বা বিদেশি বলে ঘোষণা করার বিধান। অর্থাৎ নিজেকে বিদেশি বলা যাবে, কিন্তু দেশি হওয়া যাবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের সামনে জ্বলজ্বল করছে অসমে এনআরসি-র নামে ভয়ানক ও নির্মম নির্যাতনের চিত্র। কোর্টকে শিখণ্ডী করে সেখানে অসমিয়া উগ্রবাদ ও বিজেপি-র সংকীর্ণতাবাদ মিলেমিশে এক এক দিন এক এক নিয়মের বেড়া তুলে শত শত লোককে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকিয়েছে এই বিজেপি সরকার। হিন্দু-হিন্দু গান করা এই আরএসএস-বাহিনী অসমে ১৩/১৪ লক্ষ হিন্দুকেই তো বেনাগরিক ঘোষণা করেছে। অত্যাচার, নির্যাতন করেছে, আর তখন তো তাদের নেতাদের লকলক জিব হিংসার বাণী বন্ধ করেনি। অমিত শা তো পার্লামেন্টেই বলে দিয়েছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। সম্প্রতি গুয়াহাটি হাইকোর্টও এসব নথিসহ ১৫ ধরনের প্রমাণকে এমনকী জমির নথিকেও এই কাজে মান্যতা দিচ্ছে না। আসলে এ হল সেই ভেড়া ও নেকড়ের গল্প। কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু নির্যাতন নির্বাসন চলছে। অন্যদিকে এখনও তো এই নাগরিক আইন ২০১৯-এর বিধিনিয়ম (Rules)-ই তৈরি হয়নি। তা হলে লক্ষ লক্ষ বিজেপি কর্মীরা এই কেবল শর্ত

সাপেক্ষে আবেদনের সুযোগ পাওয়া নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কিসের উপর ভিত্তি করে?

আমার উদ্বাস্তু বন্ধু ও আত্মীয়রা একটু ভেবে দেখবেন এই আরএসএস যদি সত্যই বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতে চাইত তা হলে ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ না করে শুধু বলতে পারত বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব ঘোষণা করা হল। যেমন করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি (আদবানীর স্বজাতির লোক)-দের জন্য ২০০৪ সালের নাগরিক আইনের সংশোধনীর বিধিনিয়মে; তা তো এরা এবার বাঙালি হিন্দুদের জন্য করল না। আসলে নানামুখী পলিটিক্স করার জন্য এখানে ওরা ধর্ম জুড়ে দিল। যাতে আইনটি সত্যিকার দেশের হিতে না প্রযুক্ত হতে পারে, এমনই চক্রান্ত। যারা ভারতের নাগরিক আইনের নানা সংশোধনীর বিষয়ে খোঁজ রাখেন, তাঁরা মনে করুন, 'the NDA Govt. framed Citizenship (Amendment) Rules, 2004 empowering the State of Gujrat and Rajasthan (দুটিই তখন বিজেপি শাসিত রাজ্য আর ওখানে আসা উদ্বাস্তুরা সবই অবাঙালি পাকিস্তানি) only for granting of citizenship to West Pakistan-Refugees excluding any provision for East Bengal-Refugees, an utter discrimination and denian of justice.' ২০০৪-এর এই সংশোধনী কিন্তু হয়েছিল আদবানীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এবং ধর্মের উল্লেখ না করে। আসলে এবার এরা প্রথমে (হিন্দু ও মুসলিম) বাঙালিদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে বন্ডেড লেবার করতে চায়। যাদের দিয়ে বিশ্বের কর্পোরেট পুঁজিকে সেবা করা যাবে। আর ভারতের দলিতদের নিয়ে যেতে চায় সেই প্রাচীন যুগে যেখানে শম্বুকের বিদ্যাচর্চার অধিকার নেই, শূদ্রেরা কেবল সেবা করবে। কোনো নাগরিক অধিকার এই অন্ত্যজদের থাকবে না। যা হাইডি মোদী বিগত মার্কিন ভ্রমণের সময় দেখে এসেছেন এই ধরনের আদর্শ (?) ডিটেনশন ক্যাম্পগুলি। যেখানে রাখা হয়েছে নাগরিক অধিকারহীন নানা দেশের অসহায় উদ্বাস্তুদের, সস্তা দামের মজুর হিসেবে। সেই ট্রাম্প-যাত্রাই করছেন হিটলার ও ট্রাম্পের অনুগামী তথা চোস্ত-দোস্ত নরেন্দ্র মোদীজি।

উদ্বাস্তুদের সঠিক দাবিগুলি কী?

আমরা যার No NPR, No NRC এবং No CAA এক নিশ্বাসে বলে আত্মতৃপ্ত হচ্ছি, তারা কি ভেবে দেখেছি, যদি না ক্যা সুপ্রিম কোর্ট মেনে নেয় তা হলেও অবশিষ্ট থাকবে ২০০৩-০৪-এর নাগরিক আইনের গৃহীত সংশোধনী। যেখানে বাংলাদেশের বা পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের যারা ওই ১৯৪৮-এর ১৯ জুলাইয়ের পরে বৈধ কাগজ ছাড়া এসেছেন তাঁরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, তাঁদের নাগরিকত্বের আবেদন ফর্মও দেওয়া হবে না। পশ্চিমবঙ্গের যে সব বাবুরা নানাভাবে এমনকী ১৯৭১-এর পরে এসেও চাকরি করে, রিটায়ার করে সুখে আছেন, তাদের অবস্থান কোথায় নেমে যাবে ভেবে দেখেছেন কি? আর এই যখন এ রাজ্যের বাবুদের সামনে ঝোলানো বিপদ তখন সারা ভারতের ঝুলে থাকা আধা নাগরিক তাদের অবস্থা কী হবে? এক্ষেত্রে আমাদের দাবি ক্যা বাতিলের যে সব যুক্তি আছে তা বলার আগে এই বাঙালি উদ্বাস্তু বা আজকের মুখরোচক ভাষায় মতুয়া সম্প্রদায়ের অবস্থা বিবেচনা করে **আমাদের দাবি হোক (১) ২০০৩-০৪-এর নাগরিক আইনের সংশোধনী সম্পূর্ণভাবে আগে বাতিল করো। (২) দেশভাগের বলি সমস্ত উদ্বাস্তুদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব ঘোষণা করো।** নিম্ন বর্ণের আর নিম্ন বর্গের উদ্বাস্তুদের জন্য এই দাবি আমরা সংযুক্ত না করলে, কেন ঘরপোড়া গরুর মতো বাঙালি উদ্বাস্তুরা এই সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাবেন না? তাই এই নিঃশর্ত নাগরিকত্বের ঘোষণার দাবিই অ-বিজেপি রাজনৈতিক দলের যথার্থ দাবি বলে আমরা মনে করি।

তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে আমরা No CAA-বলছি

এটা ভারতবর্ষের যথার্থ দাবি। কারণ এই যে ক্যা এনে বিজেপি দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার শিরে আঘাত হেনেছে, তা রোধ না করতে পারলে, সংবিধান না বাঁচাতে পারলে, আগামীকাল দেশের গণতন্ত্রই থাকব না। তা হলে নাগরিক বা মানবিক অধিকার থাকার কোনো প্রশ্নই থাকে না। এই দাবি তাই সমস্ত ভারতবাসীর দাবি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রবীণ প্রজন্মকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে আমাদের প্রাণের উজ্জ্বল স্বপ্নরা তথা আমাদের ছাত্র-ছাত্রী তথা জীবন্ত যৌবনেরা। তাই স্বৈরশাসকেরা নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের ওপর। তারা আক্রান্ত, তারা রক্তাক্ত, তারা আইনের নামে ভয়ানক বে-আইনের শিকার। আমাদের সাধ্যমতো শক্তিতে তাদের পাশে দাঁড়ানোই মহৎ কর্তব্য।

মুসলিম নারীদের ঐতিহাসিক অবরোধ

প্রসঙ্গত এখানে অত্যন্ত আনন্দ, আশা আর এক বুক শ্রদ্ধা নিয়ে উচ্চারণ করতে চাই ভারতে কেন বিশ্বের এক বিরল ঘটনার কথা। সে হল ঐক্যবদ্ধ নারী প্রতিবাদের নতুন নাম শাহিনবাগ। ধর্মীয় বেষ্টনীর সহস্র আঁধার ভেদ করে ভারত জননীরা নতুন বেশে এসে দাঁড়িয়েছেন, দেশের সামনে এমনকী বিশ্বের সামনে। সেখানে এসেছেন আমার বৃদ্ধা দাদিমারা, এসেছেন মধ্যবয়সি মায়েরা, এসেছেন সন্তানবুকে তরুণ জননীরা আর আমার ভবিষ্যৎ তথা নবীন প্রজন্মের ভারত-মাতারা। তারা

মৌলবাদীদের ফতোয়া উপেক্ষা করে বলেছে এটা শরিয়তের অধিকার নয় এটা ড. আম্বেদকরের সংবিধানের অধিকারের প্রশ্ন, এটা আমরা ভালো বুঝি। আপনারা এখানে নয় মসজিদে যান। আমার মনে হয় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ একদিন এই ভারতমাতাদেরই ছবি কল্পনা করেছিলেন। যারা ভারতের এই ভয়ংকর বিপদের দিনে তাদের আত্মার আত্মীয়দের, সন্তানদের, তাদের দেশকে, দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য মাতৃহৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসাকে হাতিয়ার করে এমন এক অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যা হয়তো স্বয়ং গান্ধিজিও কোনোদিন কল্পনা করেননি। বিশ্বে এই বিরল ঘটনা ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। যার স্রষ্টা আমাদের জায়া জননী ও কন্যারা। আবার বলি আমাদের সত্যিকার ভারতজননীরা আজ রাস্তায়। আসুন তাদের উদ্দেশে বলি ভারতমাতা কি জয়। আর যার যা শক্তি আছে তাই নিয়ে এই মায়েদের পাশে দাঁড়াই। সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এই দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে শান্তির যুদ্ধ ঘোষণা করি।

১। ও ২। দেখুন ঐকতান প্রকাশিত (২০২০) পুস্তিকা: অসম আন্দোলনের কালপঞ্জি।

৩। দেখুন ঐকতান গবেষণা পত্রের নাগরিকত্ব সংখ্যার ড. অতুলকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রবন্ধ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন।

৪। ও ৫। নীতীশ বিশ্বাসের বই ভারতে বাঙালি উদ্বাস্তু গ্রন্থে উদ্ধৃত সাংবাদিক রঞ্জিত রায়ের বৈষম্য চিত্র।

দেশের রাজনীতি ও বহুস্বর গণতন্ত্র

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

দিল্লির নির্বাচনি ফল তো সকলেই জানেন। ফল নিয়ে কাটাকুটি খেলা, নাচ, মান-অভিমান অনেক হয়েছে। দেশের তাতে কী লাভ বা ক্ষতি হল? সেটা বুঝতে আর একটু কাটাকুটি খেলা খেলতেই হয়।

আপ মেয়েদের ভোট অনেকটা পেয়েছে কংগ্রেস পায়নি। বিজেপিও ভোট কিছু তেমন পায়নি, তবে তাদের কথা না হয় পরে আলোচনা করব।

কংগ্রেসের হাল এমন হল কেন?

শাহিনবাগের প্রতি অকুণ্ঠ ও কার্যত শর্তহীন সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেসই, আপ নয়। তবু, কেন কংগ্রেস তাদের ভোট পেল না? নির্বাচন কেবল তো নাগরিকত্ব আইন নিয়ে নয়।

সম্প্রতি (১৭/২), সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বলেছে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া মেয়েদের পূর্ণ সম্মান ও সমান অধিকারের কথা। কংগ্রেস বা বিজেপি সরকার তো মেয়েদের পূর্ণ সম্মান ও সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। আজ প্রতিবাদের যে স্বর বা মূল অভিযোগগুলি থেকে শাহিনবাগ তৈরি হয়েছে তার পেছনে কংগ্রেস বা তার সহযোগী দলগুলির ভূমিকা নেই নাকি? সেসব দলও অত্যাচার করেছে ক্ষমতায় থাকাকালীন, কখনো আইন করে, কখনো আইন ভেঙে (বিজেপি আমলের অত্যাচার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে যে তা মেনে নিয়েও বলতে হচ্ছে একথা)। কখনো এ রাজ্যে, কখনো ও রাজ্যে এমন ছোটো-বড়ো অধিকার তথা ন্যায্য এবং প্রাপ্য সম্মান আপ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারবে এমন ভরসা তারা পায়নি।

মহিলারা ভোলেন কেমনে যে কংগ্রেস আমলেই ঘটে 'নির্ভয়া' কাণ্ড। মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে ক্ষমতায় থাকার সময় কংগ্রেস অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও শিক্ষা বা পুষ্টি বা অন্য ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য ঘোচেনি। দিল্লির মহিলারা তাই আর যেন ওই দলটির পাশে থাকতে চায়নি।

থাকতে চায়নি শিখরাও। তাদের অন্তরের ঘা শুকোয়নি আজও। দলিতরাও ভরসা রাখার কারণ পায়নি, তারা ভরসা করেনি মায়াবতীজির দলটিকেও।

তবু, মানতেই হয় যে দিল্লি নির্বাচনে আপ ইতিবাচক সমর্থন নিয়েই ফিরেছে। জল, বিজলি, শিক্ষা, বাসভাড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে আপ সরকার অসহায় দুর্বল মানুষের পক্ষে থেকেছে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথা বা বিজ্ঞাপনের যুদ্ধে না গিয়ে প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্বচ্ছতার পথে হেঁটেই মানুষের আস্থা ধরে রেখেছে।

কিন্তু কী পেল দেশ 'আপ'-এর কাছে? গণহত্যার কৌশল!

ছোটো একটা রাজ্য চালাতে যারা তাদের ওপর ভরসা রেখেছে দেশ চালাতে সেই মানুষগুলো তাদের ওপর ভরসা রাখেনি, এমনকী ভিন্ন রাজ্যের মানুষও আপ-কে সমর্থন করেনি। ভাগ্যিস!

'জয় চেয়েছিনু মহারাজ, জয়ী আমি আজ'— এই ক্ষত্রিয়ের ধ্যান-জ্ঞান। তা অরবিন্দ কেজরিওয়ালজি ক্ষত্রিয় কিনা জানি না, কিন্তু, কেবল ক্ষত্রিয় হলে চলে না, রাজ্যপাট চালাতে ব্রাহ্মণী কৌশলও চাই বুঝি। কৌশল করলেন অরবিন্দজি, শপথ অনুষ্ঠানে বিরোধী নেতাদের ছেড়ে তিনি মোদীজির মহামূল্যবান কোটের কোনা ছুঁয়ে ঝুলে পড়ার চেষ্টা করলেন। যদিও এই আপ থেকেই বিতাড়িত হয়েছেন যোগেন্দ্র যাদব বা প্রশান্তভূষণের মতো নেতারা। তবু, আরো কিছু চমক বাকি ছিল।

কেন্দ্রের শাসক বিজেপি দল 'আপ'-এর কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে, তারপর দেশে এসেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প— তিনিও শাসকদলের সম্মান তথা গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে তেমন কিছু করলেন না বা বললেন না। হতাশ নাগপুরপন্থী শাসক দলের নেতা-কর্মীরা শাসনযন্ত্র বা পুলিশ প্রশাসনকে মুঠোবন্দী রেখে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাল। এরপর স্পষ্ট হল অরবিন্দজির কৌশল। কেন্দ্রের শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদতে শুরু হল যে গণহত্যা, তার দোসর হল অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

১৯৮৪-র শিখ-নিধনযজ্ঞের পর দিল্লির বা দেশের মানুষ এমন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা গণহত্যা আর দেখেনি দিল্লিতে। মানুষ দেখেনি আরো কিছু। দাঙ্গায় প্রায় ৫০ জন মানুষ প্রাণ

হারাল। সে দাঙ্গা রোধে 'আপ' অন্তত গোড়ায় কিছু করেনি, রাজনৈতিক বা সামাজিক বা প্রশাসনিক কোনো উদ্যোগ নেয়নি। কোনো সরকারই এগিয়ে এল না ত্রাণে। পরে, দাঙ্গা নিজ নিয়মে বা চাপে, থামার মুখে মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল রাজঘাটে গেলেন প্রার্থনায় বসতে। গণহত্যাকে বললেন পাগলামি। বললেন না কার পাগলামি। মানলেন না নিজের বা তার দলের কোনো ত্রুটি।

এখানে উল্লেখ করতে পারি যে, কোনো রাজনৈতিক দলই সেই দুঃসময়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে যায়নি, যদিও দিল্লিতে বাস করেন সোনিয়া গান্ধি, প্রকাশ কারাতরা।

তবু কেবল 'আপ'-কেই অসংবেদনশীলতার অপরাধে অভিযুক্ত করছি যে সে তো অকারণ নয়। অন্তত দিল্লিতে তো অন্য কোনো দলের ওপর ভরসা করা যায় না। আর 'আপ' সদ্য বিপুল জনসমর্থন পেয়ে তখতে আসীন হয়েছে। মানুষ তাদের কাছে বেশি আশা করেছে স্বাভাবিক নিয়মে। তারা যে শুধু সে আশায় জল ঢেলেছে তাই নয়। এই 'আপ' সরকারের সাহায্যে কানহাইয়া কুমারের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশ দেশদ্রোহিতার মামলা রুজু করল। সেও এক মস্ত আঘাত। দিল্লি তথা ভারতরাষ্ট্রের পুলিশ বা প্রশাসন নিয়ে কথা না বলাই বুঝি ভালো, তারা আকাশ জুড়ে কেবল অন্ধকারের ঘোমটা টানে যে ঘোমটার আড়ালে যাবতীয় অন্যায় মান্যতা পায় একটি শর্তে— সে আঁধার যেন উজ্জ্বলতর করে মোদী নামের নক্ষত্রকে। কেজরিওয়ালজিও আর অন্ধকার আকাশে অস্পষ্ট হয়ে থাকতে চান না, তিনিও চান স্পষ্ট আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হতে, মোদীর কাছাকাছি হয়ে।

নিয়মমতো নক্ষত্রের মৃত্যু হয়। সে নিয়ম অমান্য করে দূরভিসন্ধি আর অহংকারে এই দুই নক্ষত্র নিজেরাই নিজেদের মৃত্যু প্রায় ডেকে এনেছেন। এদের শাস্তি দেবে কে? এরা হয়তো ভাবছে এভাবেই রাজ্যপাট চিরদিন তাদের দখলে থাকবে। কংগ্রেসের হাল দেখেও তাদের শিক্ষা হয় না।

শাস্তি তাদের হবেই। অপেক্ষা শুধু জনজাগরণের।

এরপর আপ অন্য রাজ্যের নির্বাচনে কী করবে? অর্থাৎ, জাতীয় নির্বাচনি রাজনীতিতে দিল্লির এই ফল কতখানি প্রভাব ফেলবে?

আপের এই সাফল্য কিছু প্রশ্ন, কিছু সমস্যারও জন্ম দিয়েছে। আঞ্চলিক দলগুলি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে যে যেমন খুশি লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপ দিতে পারে। কেবল আপ নয়, মায়াবতীর দল বা চন্দ্রশেখর আজাদ বা Asaduddin Owaisi-র দল এমন বেআক্কেলে চটকদার রাজনীতিতে ঝাঁপ দিতে পারে। ফল হতে পারে এই যে সে ঝাঁপ হবে তাদের জন্য, দেশের জন্য এবং অবশ্যই কংগ্রেস দলের জন্য মরণ ঝাঁপ। লাভ হবে বিজেপি দলের।

দিল্লির নির্বাচনেও বিজেপি দলের লাভ হয়েছে এটা না মানলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিরই ক্ষতি।

এও সত্য যে বিজেপি-র জয় ঘাবড়ে দেবার মতো কিছু হয়নি। দিল্লি বিধানসভায় ২০১৫-র তুলনায় তারা আসনসংখ্যা ও ভোটের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়েছে কিন্তু তা লোকসভা নির্বাচনি ফলের ধারে-কাছেও পৌঁছাতে পারেনি। তবে, মাথায় রাখতে হবে যে, দিল্লির ভোটাররা মূলত শহরাঞ্চলের, বিজেপি-র মূল ভরসা গ্রামাঞ্চলের ভোট। তারা যে বিশ্বাস করে গ্রামের মানুষকে আজও ধর্মের নামে বোকা বানিয়ে ভোট লুট করা যায়। সেখানে তাদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী আজও কংগ্রেস।

কংগ্রেসের অপরাধ বা ত্রুটি অনেক। তবু, তারা বিজেপি দলের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর আঘাত হানেনি, মানুষের বেশ কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করেছে চিরদিন। আঞ্চলিক দলগুলি যদি কংগ্রেসকে উপেক্ষা করে তো বিজেপি অধিকাংশ রাজ্যে লাভবানই হবে। অন্তত যতদিন না দেশের প্রতিটি কোণে সুশিক্ষার আলো পৌঁছায়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, বিজেপি জিতলে ক্ষতি কী?

আমার মতে প্রধান ক্ষতি এই যে তারা ভারতীয় তথা হিন্দু সংস্কৃতি ও ভারত রাষ্ট্রের ধারণা বদলে দিতে চায়, হিন্দুধর্মের ও ইতিহাসের ভুল ও বিকৃত ব্যাখ্যা ছড়াতে চায়, গড়তে চায় অন্য এক ভারত যে ভারত আর কোনোদিন উচ্চারণ করতে পারবে না বসুধৈব কুটুম্বকম। এই ভারতের সাগরতীরে আর কখনো সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বাঁচার স্বপ্ন দেখার অধিকারই থাকবে না। মৃত্যু হবে বহুস্বর গণতন্ত্রের।

দিল্লি গণহত্যা স্পষ্ট করেছে বামপন্থার স্বরূপ, 'আপ'-এর মানুষ-নিধনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

দেশের কী দুর্ভাগ্য— এই দেশ এখন নেতার অপেক্ষায়, যোগ্য দলের অপেক্ষায়। দেশের কী সৌভাগ্য শাহিনবাগ আন্দোলন তবু থামেনি।

এই গণহত্যা ভারতীয় রাজনীতিতে আলো জ্বালাবে— আশার আলো, বহুস্বর গণতন্ত্রের আলো।

উষ্ণায়নের হালচাল

প্রদীপ দত্ত

তিন দশক ধরে ভূ-উষ্ণায়ন কমানোর জন্য পৃথিবী জুড়ে তুমুল কর্মযজ্ঞের পরও তা বাড়ছে এবং জলবায়ুর বদল ঘটছে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছিল এক দশকে ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখন বাড়ছে প্রতি চার বছরে ০.২ ডিগ্রি। এখনই বেড়ে গেছে ১.১ ডিগ্রি। ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রার অন্তত ২.৫ ডিগ্রি বৃদ্ধি আমরা নিশ্চিত করেছি। অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু বদল এখনই প্রায় হাতের বাইরে চলে গেছে। এই অবস্থায় জেনে নেওয়া যাক নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে মুখ্য দেশগুলোর হালচাল কী? পৃথিবী নিয়ে কতটা আশা আমরা করতে পারি?

উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমেরিকার ভূমিকা কী?

পৃথিবীর মোট নিঃসরণের ২৫ ভাগই এক সময় করত আমেরিকা। নিঃসরণে দীর্ঘকাল ধরে তারা ছিল পৃথিবীর শীর্ষে। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ক্ষমতায় আসার পর নিঃসরণ কমাতে উঠে পড়ে লাগলেন। ক্লিন্টনের আমলে প্রতি পদে ছিল রিপাবলিকানদের বাধা। ওবামা সেই বাধা কাটিয়ে নিঃসরণ কমাতে আমেরিকাকে পৃথিবীর নেতৃত্বে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সদর্থক ভূমিকায় এক সময় আশা জেগেছিল পৃথিবী এই ঘোরতর সংকট কাটিয়ে উঠবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে শক্তির কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে, কার্বন দূষণের মান কঠোর করে, ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট ও নবায়নযোগ্য শক্তি চালু করে, এগিয়ে চলেছিল।

২০১৫ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামা যুক্তরাষ্ট্রে পরিচ্ছন্ন শক্তির প্রস্তাব দেন, যার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে যেন ২০০৫ সালের চেয়ে নিঃসরণ শতকরা ৩২ ভাগ কম হবে। ২০১৬ সালে আমেরিকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে যে নিঃসরণ হয়েছিল ১৯৯১ সালের পর এত কম আর কখনো হয়নি। নিঃসরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্র ছিল সবচেয়ে দায়ী, মোট নিঃসরণের শতকরা ৩১ ভাগ হত এই ক্ষেত্র থেকে। অবশ্য এখন পরিবহণই তাদের সবচেয়ে বেশি নিঃসরণের ক্ষেত্র। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে আমেরিকার প্যারিস জয়বায়ু চুক্তির প্রস্তাব হিসাবে জানিয়েছিল, তারা নিঃসরণে কমিয়ে আনবে, যাতে এই শতাব্দীতে উষ্ণায়ন ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম থাকে। প্যারিসে রাষ্ট্রপুঞ্জের জলবায়ু সম্মেলনের প্রস্তাব চূড়ান্ত হয় ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল।

ক্ষমতায় আসার পর ২০১৭-র জুন মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানালেন, বারাক ওবামার আমলে তৈরি প্যারিস চুক্তি থেকে আমেরিকা বেরিয়ে আসবে। ট্রাম্প পরিচ্ছন্ন শক্তি পরিকল্পনা সহ উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে অনেক সদর্থক পদক্ষেপ গুটিয়ে ফেলেন। কয়লা ও তেল ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে ভর্তুকি বাড়ায়। তবে আশার কথা এরপরও ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্কের মতো কুড়িটার বেশি প্রদেশ নবায়নযোগ্য শক্তি ও শক্তির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে জোরালো নীতি তৈরি করেছে। কয়লার ব্যবহার প্রসারের জন্য অনেক চেষ্টা করেও ট্রাম্প কাজের কাজ কিছু করতে পারেননি। সে দেশে কয়লার ব্যবহার কমছে, একের পর এক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার নানা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীও নবায়নযোগ্য শক্তি প্রসারের পক্ষে, ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে। ট্রাম্পের দৌরাত্ম্যে এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি সহ নিঃসরণ কমাতে যেসব সরকারি সংস্থা সক্রিয় ছিল তাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলার জন্য যতটা নিঃসরণ কমানো যেত তা হয়নি। এখন আমেরিকার নিঃসরণের ভাগ শতকরা ১৩.৭৭ শতাংশ। নবায়নযোগ্য শক্তির পক্ষে যে গতি পাওয়া সম্ভব ছিল তা হয়নি। ইউ এস সলার ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, আমদানি করা প্যানেলের উপর ট্রাম্প প্রশাসন দু বছর আগে যে শুল্ক বসিয়েছে তার জন্য সৌর শিল্প ৬২ হাজার চাকরি আর ১৯০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ হারিয়েছে। তারপরও আমেরিকা নবায়নযোগ্য শক্তির পথেই চলেছে।

ট্রাম্পের যুক্তি ছিল, এই চুক্তির ফলে মার্কিন ব্যাবসা, করদাতা ও অর্থনীতি মার খাচ্ছে। চুক্তিতে স্বাক্ষর করার তিন বছরের মধ্যে কোনো দেশ চুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে

না বলে ট্রাম্প ঠিক করেছিলেন, ২০১৯ সালের ৪ নভেম্বর আমেরিকাকে চুক্তি থেকে বার করে আনবেন। আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকা তাই করেছে। কিন্তু ট্রাম্প যতই বলুন, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরের মতে, প্যারিস চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী ২০২০-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্যারিস চুক্তি থেকে আমেরিকার বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে না। নতুন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় এলে চুক্তির পক্ষে সমর্থন জোগাড় করতে এক মাস লাগবে। ভোটাররাই সিদ্ধান্ত নেবেন। ওদিকে প্রায় প্রতিটি প্রদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ছাপ পড়ছে। উঁচু তাপমাত্রার ঘটনা বেড়েছে। নিচু তাপমাত্রার ঘটনা কমেছে। তুমুল বৃষ্টির ঘটনাও বাড়ছে।

গত সাত বছরে আমেরিকায় মোট ৭৯ গিগাওয়াট ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে। আরো ৭০ গিগাওয়াট ক্ষমতার কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কমে যাবে। ২০০০ সালে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩২৭ গিগাওয়াট, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কমে হবে ১৯১ গিগাওয়াট। নতুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কোনো পরিকল্পনা নেই।

২০১৮ সালে বন্ধ হয়েছে মোট ১৮ গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্র। ১৯৮২ সালের পর ওই বছরই কয়লার খরচ সবচেয়ে কম হয়েছে। সে দেশে শতকরা ৭৪ ভাগ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রাখার খরচ কাছে-পিঠে বায়ু কিংবা সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের খরচের চেয়ে বেশি। তাই এখন গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ঝোঁক বেশি।

চীন কি করছে?

চীনের কার্বন নিঃসরণ পৃথিভীর শতকরা ২৮ ভাগ। পাঁচ বছর আগে চিন বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমেরিকার সমকক্ষ হয়েছিল। এখন তারা আমেরিকার চেয়ে শতকরা ৬০ ভাগ বেশি উৎপাদন করে। তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০ লাখ মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে (ভারতের চেয়ে প্রায় ছ গুণ বেশি, ভারতের ৩ লাখ ৬০ হাজার মেগাওয়াট)। তবে জনপ্রতি বিদ্যুৎ খরচ আমেরিকার ১০০ ভাগের ৩৭ ভাগ। সে দেশে পরমাণু, বায়ু, সৌর ও জলবিদ্যুৎও বলবার মতো দ্রুত হারে বেড়েছে, তবে এখনও তাদের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ আসে কয়লা পুড়িয়ে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক কয়লা ব্যবহার করে। তাই তারা কী করছে তার ওপর বিশ্ব উষ্ণায়নের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে। ২০১৮ সাল প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং (Xi Jinping) ক্ষমতায় আসার আগেই চিনের শিল্পে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার খুবই বেড়েছিল, সবচেয়ে বেশি হারে তাদের কার্বন নিঃসরণ বেড়েছিল।

দীর্ঘকাল ধরে কার্বন নিঃসরণ কমানোর আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় চিন শামিল হয়নি। কবে নিঃসরণ সর্বাধিক হবে সে সম্বন্ধেও কিছু বলতে চায়নি। কারণ হিসেবে বলেছে, তারা দেশে শিল্পায়ন চায়, মানুষের জীবনমান বাড়াতে চায়। পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার চেষ্টায় ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে চীন অঙ্গীকার করে ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বাধিক নিঃসরণ করবে। নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে উৎপাদন করবে কুড়ি ভাগ বিদ্যুৎ। ওদিকে আমেরিকা জানিয়েছিল, ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০৫ সালের চেয়ে শতকরা ২৬ থেকে ২৮ ভাগ কম নিঃসরণ করবে। চিন-মার্কিন চুক্তির ফলে ২০১৫ সালের প্যারিস সম্মেলনে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশকে নিয়ে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল।

অনেক বছর ধরে দ্রুত বৃদ্ধির পর '১৪ সালে প্রথম চীনের নিঃসরণ কমেছে ১.২ শতাংশ। ২০১৫ সালে কমেছে ৩.৯ শতাংশ। তবে ২০১৭, '১৮, '১৯ সালে নিঃসরণ বেড়েছে। এক যুগের বেশি সময় ধরে চীন যেমন ব্যাপকহারে কয়লা চালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে, একই সঙ্গে নবায়নযোগ্য শক্তি ও পরমাণু বিদ্যুতে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। স্থির করেছিল ২০১০-এর মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে শতকরা ১০ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পারেনি, পেরেছে ২০১৪ সালে। চীন-মার্কিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগেই তারা ঘোষণা করেছিল, ২০২০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে তৈরি করবে বিদ্যুতের শতকরা ১৫ ভাগ। বায়ুদূষণ কমাতে নবায়নযোগ্য শক্তিতে এবং গ্যাস থেকে উৎপাদনে অনেক বিনিয়োগ করলেও এখনও দেশে ও বিদেশে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিপুল বিনিয়োগ চালিয়ে যাচ্ছে।

২০১৯ সালে চীন প্রায় ১১০ গিগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা যোগ করছে। ২০১৮-য় বাড়িয়েছিল ১২০ গিগাওয়াট, '১৭-য় ১৩৩.৭ জিগাওয়াট), যা মোট বিদ্যুতের শতকরা ৫৩ ভাগ। সেই বছর নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৭২৮ গিগাওয়াট। জলবিদ্যুৎ ৩৫২ গিগাওয়াট, বায়ুবিদ্যুৎ ১৮৪, সৌর বিদ্যুৎ ১৭৪ এবং জৈবভর থেকে ১৭.৮ গিগাওয়াট। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৩৮.৩ ভাগ হল নবায়নযোগ্য শক্তি। তবে বাস্তবে তা থেকে দেশের ২৬.৭ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। চীন ব্যাপকভাবে পরিচ্ছন্ন শক্তির উৎপাদন ও বিদ্যুতের কর্মক্ষমতা বাড়িয়েছে।

২০১৮ সালে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি কিছুক্ষা কম হলেও ২০১৯ সালে ফের ওই খাতে ব্যয় বেড়েছে। চায়না ইলেকট্রিসিটি কাউন্সিল প্রস্তাব রেখেছে তাপবিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালের মধ্যে বাড়িয়ে করবে ১৩০০ গিগাওয়াট। তবে চীন সরকার এই প্রস্তাবে কতটা সায় দেবে তা

জানা যায়নি। কারণ চীনের বহু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র লোকসানে চলছে। ২০২০ সালের মধ্যে তাদের কয়লা থেকে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১,১০০ গিগাওয়াট বা ১১ লাখ মেগাওয়াট (১ গিগাওয়াট = ১০০০ মেগাওয়াট)। তা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাত গুণ, ভারতের পাঁচ গুণ, আমেরিকার চার গুণ বেশি। তারপরও ১৪৮ গিগাওয়াট ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজ হয় শুরু হয়েছে নয়তো শুরু হতে চলেছে। বাকি পৃথিবীতে তৈরি হচ্ছে ১০৫ গিগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত ১৮ মাসে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হলেও চীন একাই অনেক বাড়িয়েছে, নিঃসরণও অনেক বেড়েছে। ইউরোপের চেষ্টা, আমেরিকায় তাপবিদ্যুতের হেরে যাওয়ার ঘটনা ঢাকা পড়ে গেছে। ওই সময়কালে বন্ধ হয়েছে ৮.১ গিগাওয়াট, চালু হয়েছে ৩৫ গিগাওয়াট ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

নিঃসরণ কমাতে ভারতের ভূমিকা কী?

উন্নত বিশ্বের সাধ্য ও আর্থিক ক্ষমতার বিচারে নিঃসরণ কমানোর জন্য চেষ্টা যথেষ্ট নয়। তাদের প্রশ্ন করতে হবে নিঃসরণ কমাতে তোমাদের যথেষ্ট পদক্ষেপ নেই কেন? তবে সেই অজুহাতে চীন, ভারতের মতো দেশের বসে থাকা চলে না। মোট নিঃসরণে আমাদের ভাগ যথেষ্ট, শতকরা ৬ থেকে ৭। নিঃসরণ কমাতে হলে সব দেশকেই একসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে হবে। কয়েকটা দেশ যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করে অন্য কিছু দেশের অসহযোগিতা থাকলে মোট নিঃসরণ আদৌ কমবে না। তাই অন্যরা করবে আমরা কিছুই করব না, ক্রমপুঞ্জিত নিঃসরণ আমাদের কম, এই যুক্তি এখন অচল। সমস্যা এমন ঘোরতর হয়েছে যে কালক্ষেপের সময় নেই। প্যারিস শীর্ষ সম্মেলনে তাই সব দেশের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, কে কতটা নিঃসরণ কমাতে পারবে? যেন সব দেশ কম কার্বন অর্থনীতিকে বরণ করে নেয়।

২০০০ সাল থেকে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার দ্বিতীয় বৃহৎ বৃদ্ধি হয়েছে ভারতে, বেড়েছে তিনগুণের বেশি। এখন তাপবিদ্যুতের মোট উৎপাদন ক্ষমতা হয়েছে ২২১ গিগাওয়াট। জাতীয় বিদ্যুৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী তাপবিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২০২৭ সালে বেড়ে হওয়ার কথা ২৩৮ গিগাওয়াট। তবে অনেক বিশেষজ্ঞের তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ কার্বন নিঃসরণের বিপদ ছাড়াও তাপবিদ্যুৎ এখন অলাভজনক ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ ছাড়া বায়ু ও সৌরবিদ্যুতের মতো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা হয়েছে ৮৬ গিগাওয়াট।

ভারতের বায়ু ও সৌরবিদ্যুতের মতো নব নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ নতুন তাপবিদ্যুতের চেয়ে অনেক সস্তা। শুধু সেই কারণেই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বদলে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদন বাড়ানো দরকার। দেশের পাওয়ার সেক্রেটারির মতে, প্রায় ১০ গিগাওয়াট ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থনৈতিক কারণে চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে, আরো ৩০ গিগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থনৈতিক চাপে রয়েছে। ওদিকে নবায়নযোগ্য শক্তির দাম তাপবিদ্যুতের চেয়ে অনেক কমে গেছে, এই শক্তির বিপ্লব কয়লাকে ঋণের খাদের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু চীনেই নয় ভারতেও অনেক পরিকল্পিত প্রকল্প বাতিল করতে হয়েছে। তারপরও যেসব তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে এবং নতুন কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে ভারতে এমন তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯৪ গিগাওয়াট। এর মধ্যে রয়েছে ৩৬ গিগাওয়াট ক্ষমতার নির্মীয়মাণ কেন্দ্র, আর্থিক সমস্যার জন্য তার মধ্যে ২০ গিগাওয়াট কেন্দ্রের কাজ এখন বন্ধ রয়েছে।

বিদ্যুৎ মজুত প্রযুক্তিতেও বড়ো সাফল্য আসতে চলেছে। কম কার্বন প্রযুক্তির প্রয়োগ এখন নির্ভর করছে সদিচ্ছার উপর। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে বলে ভারতের তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য অংশ কাজেই লাগে না। তারপরও আমরা নতুন তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে চাই। নতুন নতুন কয়লা খনিও খুলতে চলেছি। এখনই সেসব বন্ধ করা দরকার।

আমাদের দেশের কৃষকরা জলবায়ু বদলের জন্য খুবই ভুগবে। বৃষ্টিপাত অনিয়মিত হলে চাষের ক্ষেত্রে ঘোরতর সমস্যা হয়। তা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে ক্রমাগত মাটির নীচের জল ব্যবহারের জন্য জলের আকাল দেখা দিচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আকাল আরো বাড়বে। মনে রাখতে হবে, অবস্থা প্রতিকূল হোক দেশের মানুষকে খাওয়াতে গেলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতেই হবে। নইলে বাড়বে অনাহার।

শহর কীভাবে গড়ে উঠছে তাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজন সুস্থায়ী শহর ও নগর। যেখানে ব্যাপক গণপরিবহণ ব্যবস্থা থাকবে। সিঙ্গাপুর যেমন করেছে, নতুন গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ঢিলে দিলে গাড়ির সংখ্যা কমবে। শহরের দূষণ কমিয়ে তা বাসযোগ্য করে তুলতে হবে। উষ্ণায়নের ফলে আমরা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। সেই কারণে নিঃসরণ কমাতে আমাদের দায়বদ্ধ থাকা দরকার। কম কার্বন নিঃসরণের অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের দেশের দুই প্রধান জাতীয় দলের লোকসভা নির্বাচন ম্যানিফেস্টোর একেবারে শেষের দিকে জলবায়ু বদলের উল্লেখ রয়েছে। দুই দলের নেতারাই মনে করেন উন্নয়নের জন্য

আরো বেশি জীবাশ্ম জ্বালানির প্রয়োজন। এমন সময় তাঁরা একথা বলছেন যখন সৌরবিদ্যুতের দাম তাপবিদ্যুতের প্রায় অর্ধেক হয়েছে এবং বিদ্যুৎ মজুদ করার জন্য ব্যাটারি প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও দাম ক্রমেই কমছে। অনেকের মতে, যদি জীবাশ্ম জ্বালানির স্বাস্থ্যের ক্ষতির হিসাব করা যায় তা হলে দেখা যাবে ইলেকট্রিক ভেহিকেল বা বৈদ্যুতিক যান প্রথাগত যানের চাইতে সস্তা। তবে বায়ুদূষণের উত্তর বৈদ্যুতিক যান নয়, সরকারি গণপরিবহণ। তা না করে আমরা শ্বাসরুদ্ধ শহরগুলোর গাড়ির সংখ্যা বাড়াতে চাইছি। মনে রাখতে হবে বায়ু দূষণের সমস্যার নিরিখে ১৮০টা দেশের মধ্যে আমরা রয়েছি ১৭০ নম্বরে। তারপরও কয়লার ব্যবহার বাড়াতে চাইছি। বায়ুদূষণ, জলদূষণ নিয়ে আমরা সঠিক ও জোরদার পদক্ষেপ নিচ্ছি না।

ব্রিটেনের হ্যাডলি সেন্টার ফর ক্লাইমেট প্রোটেকশন অ্যান্ড রিসার্চের সহযোগিতায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল মেটিওরোলজির গবেষণা থেকে জানা গেছে: গ্রিনহাউস গ্যাস ও সালফেটের অ্যারোসল বাড়ার জন্য এই শতাব্দীতে ভারতে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা দুই-ই বাড়বে। মধ্য ভারতে শতকরা ১০ থেকে ৩০ ভাগ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বছরে যে বলবার মতো পরিবর্তন হবে তা বলা যায় না। চলতি শতাব্দীর শেষে ভারতের গড় তাপমাত্রা বাড়বে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সারা ভারতেই ব্যাপকভাবে তাপমাত্রা বাড়বে, বেশি বাড়বে ভারতের উত্তর দিকে।

পৃথিবীর সামগ্রিক হালচাল কেমন?

২০০০ সাল থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে চিনের তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে পাঁচগুণ, হয়েছে ৯,৭২,৫১৪ মেগাওয়াট। তা পৃথিবীর ৪৮ শতাংশ। আরো ১৯৮,৬০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। আমেরিকার উৎপাদন ক্ষমতা হল ২,৬১,০৩৭ মেগাওয়াট, পৃথিবীর ১৩ শতংশ, নতুন পরিকল্পনা নেই। ভারতর তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২,২০,৬৭০ হাজার মেগাওয়াট, পৃথিবীর ১১ শতাংশ। পরিকল্পনা রয়েছে উৎপাদন আরো ৯৩,৯৫৭ মেগাওয়াট বাড়ানোর। বর্তমানে কার্বন নিঃসরণ সবচেয়ে বেশি হয় এশিয়া থেকে। চিনের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৭০ ভাগ, ভারতের ৭৫ ভাগ আসে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে।

কয়লা থেকে পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ২০০০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১,০৬৬ থেকে বেড়ে হয়েছে ২,০২৪ গিগাওয়াট। তবে বাড়ার হার কমছে। ২০১৮ সালে বেড়েছে ২০ গিগাওয়াট, যা কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম। সবচেয়ে বেশি চিন ও ভারতে। এরপরও ২৩৬ গিগাওয়াট ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে, আরো ৩৩৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। অবশ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ১৮৬ গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীর বেশ কিছু তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশ উৎপাদন বন্ধ করে দেবে বলে ঠিক করেছে। কিন্তু হলে কী হবে, এখন ৭৮টা দেশ কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। আরো ষোলটা দেশ এই ক্লাবে যোগ দিতে চলেছে।

ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আই ই এ) জানিয়েছে, উষ্ণায়ন ২ ডিগ্রির মধ্যে বেঁধে রাখতে হলে ২০৪০ সালের মধ্যে পৃথিবীর সব তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হবে। তার মানে এখন থেকে প্রতি বছর গড়ে ১০০ গিগাওয়াট ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হবে। অর্থাৎ ২০৪০ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন প্রায় একটা করে কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু নানা দেশে শক্তি উৎপাদনের যে পরিকল্পনা রয়েছে তা থেকে বোঝা যায় তা হবার নয়। তবে বন্ধ করে দেওয়ার হার বেড়েছে। ২০১০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত মোট ২২৭ গিগাওয়াট ক্ষমতার পুরোনো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়েছে।

আই ই এ জানিয়েছে, পৃথিবীতে কয়লার বিনিয়োগ এরই মধ্যে তার শিখরে পৌঁছে গেছে, এখন নাটকীয়ভাবে কমতে শুরু করেছে। চিনে আর নতুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির প্রয়োজন নেই। বিনিয়োগ কমছে মানে তাপবিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াও কমেছে। ২০১১ সালে উৎপাদনক্ষমতা বেড়েছিল ৮২ গিগাওয়াট। ২০১৮-য় তা কমে হয়েছে ২০ গিগাওয়াট। ২০১৮ সালে বন্ধ হয়েছে ৩৩ গিগাওয়াট ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ২০১৫ ও ২০১৬ সালেও প্রায় এই হারে বন্ধ হয়েছিল। ২০১৭ সালে মাত্র ছ'টা নতুন কেন্দ্র চালু হয়েছিল, যেখানে ২০০৬ সালে চালু হয়েছিল ২৭৪টা কেন্দ্র। ২০১৮ সালে হয়েছে ৭টা। চিন কয়েকশো ছোটো, পুরোনো, অদক্ষ উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ করে, বড়ো ও বেশি কর্মক্ষমতা সম্পন্ন কেন্দ্র চালু করেছে। যেহেতু তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখনও বেড়ে চলেছে তাই যেসব কেন্দ্র আগে থেকে চালু রয়েছে তা কম সময় চালু রাখতে হচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শিখরে পৌঁছবে ২০২২ সাল নাগাদ।

২০০০ সালে ৬৬টা দেশ কয়লা থেকে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করত। এখন তেমন দেশের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭৮। ১৩টা দেশ নতুন করে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে তার মধ্যে বেলজিয়ামও রয়েছে কিন্তু তারা এরই মধ্যে কয়লা থেকে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করে দেবে বলে স্থির করেছে। আরো ১৩টা দেশ যারা পৃথিভীর মোট উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৩

শতাংশ উৎপাদন করে, ঠিক করেছে ২০৩০ সালের মধ্যে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। এদের নিয়ে তৈরি হয়েছে 'পাওয়ারিং পাস্ট কোল অ্যালায়েন্স', যার নেতৃত্বে রয়েছে ব্রিটেন ও কানাডা। ২০১৯ সালে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে জার্মানি, যারা পৃথিবীর ৩ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। অন্যদিকে ষোলোটা নতুন দেশ আগামী দিনে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চলেছে, তাদের মধ্যে মিশরও রয়েছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করার ঝোঁক প্রবল। ২০০০ সালের পর থেকে মোট উৎপাদন ক্ষমতা কমে হতে চলেছে ৭০ গিগাওয়াট, ২০০০ সালে যা ছিল তার এক-তৃতীয়াংশ। কানাডা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, আয়ারল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড স্থির করেছে ২০৩০ সালের মধ্যে সমস্ত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেবে। অর্থাৎ ৪২ গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে। যার মধ্যে বেশ কয়েকটি নতুন নির্মিত কেন্দ্র রয়েছে। তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে পঞ্চম বৃহৎ হল জার্মানি, উৎপাদন ক্ষমতা ৪৮ গিগাওয়াট। তারাও ২০৩৮ সালের মধ্যে সব তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেবে। তারপরে বন্ধ হবে পোল্যান্ডের ৩০ গিগাওয়াট ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো। তবে প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য মানতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সব তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া দরকার।

চীন-ভারত বাদে এশিয়ার অন্যান্য দেশ ২০১৮ সালের মধ্যে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে করেছে ১৯১ গিগাওয়াট, ৫০ গিগাওয়াট নতুন কেন্দ্র নির্মাণ করছে, আরো ১০৪ গিগাওয়াট ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের বহু প্রকল্পে টাকা ঢালছে চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। বহু ক্ষেত্রে বড়ো বড়ো তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করছে সাধারণ মানুষ। ২০১৬ সালে যতগুলো নতুন কেন্দ্রের পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার এক-তৃতীয়াংশ বাতিল বা মুলতবি রাখা হয়েছে। ভিয়েতনামের ৪২ গিগাওয়াট ক্ষমতার নতুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা ছিল। তার মধ্যে ১০ গিগাওয়াট ক্ষমতার কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে। তার সরকার নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনেও গুরুত্ব দিচ্ছে। নবায়নযোগ্য শক্তির বিকাশে দায়বদ্ধতা রয়েছে, বেসরকারি ক্ষেত্রের নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের আগ্রহ রয়েছে। ভিয়েতনাম পরিকল্পনা করেছে গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। সেক্ষেত্রে বেশ কয়েকটা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যাবে।

ইন্দোনেশিয়ার সরকার এখনও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তার আগে যা পরিকল্পনা ছিল গত বছর তা থেকে ১০ গিগাওয়াট ছেঁটে কম করেছে।

২৫তম শীর্ষ সম্মেলনে

সাম্প্রতিক মাদ্রিদে ২৫তম শীর্ষ সম্মেলনে (সিওপি ২৫) নিঃসরণ কমানোর ব্যাপারে এক চুলও অগ্রসর হওয়া গেল না। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন চেয়েছিল '৫০ সালের মধ্যে নিঃসরণ শূন্যে নিয়ে আসবে। কিন্তু পোল্যান্ড সেই সিদ্ধান্তে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সব দেশই চাইছিল চীন দু-এক বছরের মধ্যে তাদের নিঃসরণ সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে আসুক। কারণ তারা ২০১৮ সালের মধ্যে ২০ বছরে নিঃসরণ ৩২০ কোটি টন থেকে ১০০০ কোটি টনে বাড়িয়ে ফেলেছে। চীন এখন নিঃসরণ করে পৃথিবীর শতকরা ২৯ ভাগ। নিঃসরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যারা আছে সেই আমেরিকা, ভারত ও রাশিয়া মোট যা নিঃসরণ করে চীন একাই তার চেয়ে বেশি। কাজেই তারা যদি তা না কমায় তা হলে পৃথিবীর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। মাদ্রিদে কয়েকটা দেশের আবেদন ছিল চিন ও ভারত যেন স্বেচ্ছায় তাদের নিঃসরণ কম করে। কিন্তু চিন জেদ ধরে রইল, প্যারিস চুক্তিতে যেমন বলা হয়েছে, ২০৩০ সালেই সর্বোচ্চ নিঃসরণ করবে।

অথচ চীন পারত কারণ তাদের তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আর খুব বেশি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, বিশেষজ্ঞদের মতে এখনই তা প্রায় সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। বাকি পৃথিবীর মতো চীনের নিঃসরণও অতি দ্রুত সর্বোচ্চ হওয়া প্রয়োজন, তারপর থেকে দ্রুত তা কমিয়ে আনা দরকার। ভারতও পারে, ভারতের দু'লক্ষ কুড়ি হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার এক-পঞ্চমাংশ কাজে লাগে না, আর্থিকভাবে সেইসব কেন্দ্র বিপন্ন, অনেক কেন্দ্র নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হয়ে রয়েছে। তা ছাড়া সৌর ও বায়ুবিদ্যুতের চেয়ে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ অনেক বেশি। সৌর ও বায়ু বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর বিপুল সুযোগও রয়েছে।

২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির সময় নানা দেশের মধ্যে যে উদ্যোগ ও বিশ্বাস ছিল যে 'আমরা পারি', তা এখন উধাও। প্রতি বছর জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানির কয়েকশো প্রতিনিধি সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে নানাভাবে গোলমালের চেষ্টা করে। আমেরিকা চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার পরও বাইরে থেকেই সদর্থক চুক্তি যেন না হয় সে ব্যাপারে সক্রিয় থাকে। সর্বোপরি নানা দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বাতাবরণের এখন খুবই অভাব। জাতীয়তাবাদ ও অর্থনৈতিক দূরবস্থার যুগে তা বাড়ছে।

২০১৯ সালে কয়লা থেকে শতকরা ৩ ভাগ কম বিদ্যুৎ

উৎপাদন হয়েছে। তারপরও মোট নিঃসরণ হয়েছে ৪০৫৭ কোটি টন, ২০১৮-র চেয়ে ২৫.৫ কোটি টন বেশি। আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে কমেছে ১.৭ শতাংশ, চীনে বেড়েছে ২.৬ শতাংশ, ভারতে ১.৮ শতাংশ। তবে ভারতে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ার বদলে কমেছে। পৃথিবীতে কয়লা থেকে দূষণ ১ ভাগ কমেছে, প্রাকৃতিক গ্যাসের দূষণ বেড়েছে শতকরা ২.৬ ভাগ।

সূত্র : প্রদীপ দত্ত, জলবায়ু বদলের কী ও কেন, দিশা, ২০২০

এ পরবাসে রবে কে

সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায়

কে ভেবেছিল এমন দিনও আসবে। হয়তো ভাবনা ছিল, বলা ভালো ভাবনায় ভয় ছিল কারো কারো, কিন্তু তাও কি এমন দেখব! দেখলাম তো তবু। মফস্বলে বসবাস ছিল বাংলায়, বেশ গুছানো জীবন, কিছুটা বিপ্রতীপে হাঁটাও ছিল। তবুও পুরোটাই জাত ধর্ম শিকেয় তুলে। মা-বাবার কল্যাণে জাতপাত আলাদা করে দেখার ব্যাপারটাই ছিল না। ওই যা একটু এঁটোকাঁটা, তাও তো দিব্যি না মেনে কাটিয়ে দেওয়া গেছে। তা বলে পুজোআচ্চা বাদ যায়নি। নিত্যি ওসবের চর্চা, তবে আমাদের ছোটোবেলাতেই ওটা শুধুই আনন্দ। ফলে জাত-ধর্ম ব্যাপারটা সচেতনভাবে ঢোকেনি মনে। ধরে নিয়েছিলাম এরকমই স্বাভাবিক। এমনকী এই ধারণা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত প্রায় একই ছিল। এখনও তাই-ই আছে, তবে সব্বাইকে একরকম মনে করেছিলাম কিনা! ধরে নিয়েছিলাম সবার বোধটাই এমন। বাবরি মসজিদ ভাঙার পর, কেমন শিউরে উঠলাম। গুজরাট দাঙ্গা যেন আরো নাড়িয়ে দিল। লোকজন যে বদলে যাচ্ছে টের পাচ্ছিলাম। তবু বলব দিল্লি বা কলকাতায় থাকার সুবাদে এই ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতা তেমনভাবে ধরা পড়েনি। দিল্লিতে মূলত সবরকম জাতি, ধর্ম, বর্ণ-এর মানুষের বসবাস। এখান থেকেই ছোট্ট ভারতবর্ষ দেখা যায়। কাশ্মীরি আন্টিজির প্রাতঃভ্রমণ, কেরালিয়ান বউটির চারিদিকে ভেসে আসা খোপার জুঁই-১২-এর গন্ধ। উত্তর প্রদেশের মুসলিম বধূটির রাঁধা ইদের দিনে বিরিয়ানির স্বাদ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাচ্চাগুলোর দাপিয়ে খেলে বেড়ানো ফুটবল, বাঙালি বউটির প্রিয় সঙ্গী সর্দারনির সঙ্গে যত প্রাণের কথা। বুদ্ধ পুর্ণিমায় দরজার সামনে বৌদ্ধ রমণীর প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা। আর ক্রিসমাস ক্যারোলে গেয়ে সন্তাক্লজ সেজে বাজনা বাজিয়ে ঘরে আসা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দল। এসেই হাতে চকোলেট গুঁজে দেওয়া। আর দুর্গাপুজো তো আছেই। সদর্থের সর্বজনীন। শুধু পুজোর ভোগ খাওয়ার পঙ্‌ক্তি দেখেই চোখবুজে শ্রেণিহীন সমাজ দেখার পরিতৃপ্তি আস্বাদ করা যায়। এই হল দিল্লি।

সেই দিল্লিতে সবকিছু ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল এই দুর্যোগ, দাঙ্গা। নাকি পরিকল্পিত গণহত্যা। আতঙ্কিত লাগছিল প্রথমে দীর্ঘদিনের যাপনকালে এরকম তালের অভাব। দীর্ঘদিন ধরে চলছে শাহিনবাগ। না সেখানে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক দুর্গতি বা দুর্মতি কারো হয়নি। হলেও তা রুখে দেওয়া হয়েছে। আঘাত এসেছে বারবার, তবু লক্ষ্যে অবিচল শাহিনবাগ। কিন্তু উত্তরপূর্ব দিল্লিতে কী এমন ঘটল? আসলে ঘটল নাকি ঘটানো হল?

সিএএ বিরোধী মানুষ প্রতিবাদে বসেছিল, তার প্রতিবাদে লোকসভায় পাশ করা আইনের সপক্ষে মিছিল। বিষয়টি মাথায় ঢুকতে একটু কষ্ট হল। যা কিনা ইতিমধ্যেই আইন, তার জন্য আবার মিছিল কেন? হতে পারে, নিয়ম নীতি সব এমন হতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন, এভাবে কোনো দলীয় নেতাদের প্ররোচনামূলক মন্তব্যের কী দরকার ছিল? কীসের এত ঘৃণা! দিল্লির সীমান্ত পেরিয়ে লোক ঢুকিয়ে, আগুন লাগিয়ে এই বর্বরতা, খুনজখম কী দেবে আমাদের? কার বিশ্বাস নষ্ট করতে চেয়েছিল দাঙ্গাবাজরা। পাশের বাড়ির শমসের যেন তার ছোটোবেলার বন্ধু, বেড়ে ওঠার সঙ্গী রোহিতকে বিশ্বাস না করে? নাকি গ্যারেজওয়ালা বলবির সিং তার গ্যারেজে কাজ করা ষোলো বছরের ছেলেটাকে ছুঁড়ে দেয় আগুনের দিকে? কিন্তু না তা হয়নি। তাদের বিশ্বাস কিন্তু তলানিতে ঠেকেনি, বরং তারা কাঁধে কাঁধ রেখে প্রতিবেশীকে আশ্রয় দিয়েছে দুর্দিনে, পোয়াতি বউটাকে আগলে রেখেছে, বিহার বাংলা থেকে আসা শ্রমিকগুলোকে লুকিয়ে রেখেছে। আর যারা এই ইন্ধনে সাড়া দিয়ে মেতে উঠেছে নরমেধযজ্ঞে তারা আর যাই হোক কোনোদিন কারো কাছের ছিল না। নালিতে ডুবে থাকা লাশ, হারিয়ে যাওয়া মানুষ, রাস্তায় ফেলে গুলি করা মানুষ, মর্গে শুয়ে থাকা দুই সন্তানের বাবা যে দুধটুকু কিনতে বেরিয়েছিল সন্তানের জন্য, এই একবিংশ শতকে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গেল একরাশ ঘৃণা।

আমরা তো পরস্পরের ভরসায় বাঁচব বলেই বাসা বেঁধেছিলাম এই মাটিতে। ভজনপুরা, শিববিহার, মৌজপুর

ইত্যাদি মিলিয়ে ওই পুরো উত্তর পূর্ব দিল্লিতে একটা চক্কর মারার পর মনে হচ্ছে বিস্তীর্ণ এলাকা আসলে স্বজন হারানো শ্মশান, আমাদের বিবেকের দাফন হয়েছে ওখানে, মনুষ্যত্বের চিতা জ্বলছে। বেশিরভাগ মানুষই সর্বস্ব হারিয়ে বসে আছে ত্রাণ শিবিরে। স্কুল, কোচিং সেন্টারও ছাড় পায়নি অশিক্ষিত ধর্মের দালালদের হাত থেকে। ভয় ভয়... ভীষণ ভয় দানা বাঁধছে আমাদের মনে। কারণ এতকিছুর পরেও কিছু মানুষ যেভাবে নখদাঁত বের করে হিংস্রভাবে মৌলবাদের কথা, অন্ধ ধর্মীয় স্তুতি করে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলে কেউ ছিলেন না, ছিলেন না নেতাজি, বিবেকানন্দ, গান্ধি, সূর্য সেন, ভগত সিং অথবা নজরুল। যেন ইয়াদ পিয়া কি আয়ে...র সুরে বড়ে গোলাম আলী ভাসাননি যৌবন, যেন বেনারস তীরে বিসমিল্লার সেহনাই মাতিয়ে তোলেনি মন, যেন জাকির হোসেনের তবলার গুঞ্জ আর রবিশঙ্কর-এর যুগলবন্দি ব্রাত্য ছিল আমাদের কাছে। যেন এখনও সেই এ কে হাঙ্গল শোলে নামক জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে একটি সংলাপ বলে চলেছেন 'ইতনা সান্নাটা কিঁউ হ্যায় ভাই'... সান্নাটা... নীরবতা অন্ধকার...

হ্যাঁ এখন গভীর অন্ধকার এ সময়, আমরা চোখ বুজে নিয়েছি কারণ সভ্যতার রক্তস্রোত থামছে না, আর আমরা সহ্য করতে পারছি না। যেন হিমযুগ আসছে, যেন গ্রাস করে নেবে সব কিছু... তবু যদি আবার হোমোস্যাপিয়েন্সের বিবর্তন হয়, তবে যেন তা শুধু মানুষই হয়। আর কিচ্ছু নয়। কোনো জাত নয়, বর্ণ ধর্ম কিছু নয়। এমন পরিব্যাপ্তন হোক সেই মানবমনের যেন কোনো জাতিবিদ্বেষ-ধর্ম-বর্ণ তাকে স্পর্শ করতে না পারে। সুচেতনা কোনো দূরতর দ্বীপ না হয়ে, বিকেলের সোনালি নক্ষত্রের মতো জ্বলুক আমাদেরই মধ্যে। আবার কোনো উজ্জ্বল সকাল হোক... থাকুক আকাশ ভরা সূর্য তারা,...বিশ্বভরা প্রাণ। মানুষ বাঁচুক মানবিকতা, বিবেকবোধ, আর শুভ চেতনায়... কারণ আমরা তো জানি...এই পৃথিবীর রণ-রক্ত-সফলতা সত্য...কিন্তু শেষ সত্য নয়।

অথ টোলরহস্যকথা ও একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন—২

দেবোজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগরীয় শিলমোহর

এতক্ষণ বিদ্যাসাগরের কথায় আসিনি। এ প্রসঙ্গে মোটামুটি ওয়াকিবহাল যে কেউ জানে যে, এ প্রশ্নটায় একটি পাকাপোক্ত বিদ্যাসাগরীয় শিলমোহর আছে, কারণ মূলত বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই সদ্য হওয়া সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচিতে কিছু পরিবর্তন হতে থাকে যা আধুনিক প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে বাঙালি মানসে বিদ্যাসাগরের প্রধান পরিচয় আজও মূলত বর্ণপরিচয়ের লেখক ও একজন 'নিরামিষ সমাজ সংস্কারক'[৭] হিসেবে! কিন্তু এর পেছনে তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক বা দার্শনিক পরিচয়টা শুধু যে মুছেই গেছে তা নয়, গোঁড়া ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিত মহলে তাঁর এই পরিচয়টা আদৌ স্বীকার করাও হয় না। ভদ্রলোকের অপরাধ যে তিনি ১৮৫৩ সালে তাঁর শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাবে রীতিমতো আস্তিন গুটিয়ে বেদান্ত আর সাংখ্যকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছিলেন, '... that Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute... Whilst teaching these in the Sanskrit course we should oppose them by souond Philosophy in the English course to counteract their influence.' [Vidyasaagar to Dr. Mouat, 1853]

এ কথা স্মরণ করে আজ প্রায় ১৭০ বছর পরেও যে গোঁড়া পণ্ডিতকুল দাঁত কিড়মিড় করে তার প্রমাণ আছে।

অথচ বিদ্যাসাগর রীতিমতো প্রথাগত টোল পরম্পরায় শিক্ষিত। ১৮৩৮-এ বেদান্তের পাঠ সমাপ্ত করেছিলেন যথারীতি পরীক্ষায় প্রথম হয়েই। কিন্তু একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, বিদ্যাসাগর রীতিমতো ফ্রান্সীয় বেকনীয় মেজাজে কোমর বেঁধে টোলের পরম্পরাগত শিক্ষাসূচি সংস্কারে নেমেছিলেন, যেটা তাঁর সমসাময়িক সংস্কৃত পণ্ডিতদের জ্ঞানমানস থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। বর্ণপরিচয় যেমন সংস্কৃত ভাষার জটিল ও সর্বোপরি সময়সাপেক্ষ আবর্ত থেকে বার করে নতুন ঝকঝকে বাংলা ভাষার পথ কেটেছিল, তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের অঙ্ক শেখার জন্য শ্লোকে লেখা দ্বাদশ শতাব্দীর লীলাবতীর জায়গায় ইংরেজি বই থেকে পাটিগণিত ও বীজগণিত শেখানোর জন্য সওয়াল..., বা এতদিন ধরে চলে আসা পৌরাণিক ভূগোল বা সৃষ্টিতত্ত্বের (Puranic Cosmology) জায়গায় আধুনিক ভূগোলের জন্য সওয়াল।

এগুলো সে সময়ের চালচিত্রে ফেলে দেখলে অতিমানবীয় লাগে যখন সংস্কৃত পণ্ডিতদের লেখার ভাষা তো দূরস্থান, মুখের ভাষাও ভয়ানক রকম সংস্কৃতগন্ধী ছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় সে সময়ের সংস্কৃত পণ্ডিতদের মুখের ভাষার কিছু ভয়াবহ নমুনা পাওয়া যায়।[৮] এমনকী গত শতকের সত্তরের দশকেও এমন নৈয়ায়িক পণ্ডিতের কথা জানা যায় যিনি বলতে ভালোবাসতেন যে, বাংলা ভাষায় তিনি স্বহস্তে লিখতে পারেন না! তার কারণ নাকি সংস্কৃতে যেখানে এক ছত্রে কাজ হয় বাংলায় সেখানে দশপাতাতেও কুলোয় না!!

এসব অক্ষম অজুহাতের কোনো টীকা নিষ্প্রায়োজন।

আসলে টোল প্রশিক্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বেকনীয় মেজাজ তাঁকে টোল শিক্ষার বিষয়গত অবকাশ ও ত্রুটিগুলি তুলনামূলক প্রেক্ষাপটে নির্মোহভাবে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করেছিল, যার ফলে তিনি সংস্কৃত কলেজকে আরেকটা নতুন টোল হিসেবে গড়ে তুলতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতই ভারতীয় শিক্ষার অতীত ঐতিহ্যের প্রায়োগিক পূনর্মূল্যায়ন যেটা আধুনিক তথ্যের ভাঁড়ারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

কিন্তু আমরা আজ জানি যে বিদ্যাসাগরের এ চেষ্টা কার্যকর হয়নি। সংস্কৃত শিক্ষার কোনো পাঠক্রমের সঙ্গেই বিজ্ঞানের কোনো তাল মিল আজ অবধি হয়নি। হলে আজও টোলের ঐতিহ্য অবিকৃত অবিকল পুনরুদ্ধারের অক্ষম সওয়াল উঠত না।

আরো আশ্চর্য লাগে এইজন্য যে বিদ্যাসাগরের মতো উচ্চতর কোনো মানুষের থেকে আসা সত্ত্বেও এ প্রস্তাব বাঙালি জনমানসেও মোটে স্থায়ী হয়নি! এ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে

সামাজিক বা এমনকী বিদ্বৎ পরিসরেও দানা বাঁধেনি কোনো শিক্ষা সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি সংলাপ (academic Dialogue) যাতে করে এ প্রশ্নগুলো তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে আরো বিশদে কাটাছেঁড়া হবে। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবকে সে সময়ের দেশি সমাজের চালচিত্রে কালাপাহাড়ি মনে হতেই পারে, কিন্তু এ প্রশ্নটাও কখনো গুরুত্ব দিয়ে ভাবা শুরুই হল না যে, কোনো একটা দর্শনের সে বেদান্তই হোক বা সাংখ্য, ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত হওয়া ঠিক কীসের ওপর নির্ভর করে? বিজ্ঞান তার বিকাশের গত ৩০০ বছরের ইতিহাসে নানাভাবে নানা সময় ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয়েছে। সত্যি বলতে কী, বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করবে, এমন ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হতে হতেই বিজ্ঞান এগোয়। কথাটা হয়তো বেজায় গোলমেলে শোনাবে, তবু অস্বীকার করার জায়গা নেই যে বৈজ্ঞানিক সত্যের আয়ুকাল অনন্তকাল বলে দাবি অন্তত কোনো বৈজ্ঞানিকই করবে না। সুতরাং বিজ্ঞানের ভ্রান্ত হওয়া, আর কোনো বিশেষ দার্শনিক মতের ভ্রান্ত হওয়া জ্ঞান তাত্ত্বিক নজরে এক জিনিস নয়। কিন্তু তা বলে কি সত্য (Truth) বলে যা 'আছে' বলে ভাবি তার কি অনেক মুখ!! তা কি বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের জন্য একরকম নয়?

Comparative epistemology-র দিক থেকে দেখলে এ একটা গোলমেলে প্রশ্ন বই কী! কিন্তু ভাবনার বিষয়বস্তুর Tagline যাই হোক না কেন— বিজ্ঞান বা দর্শন, তার সবটাই যে নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয় এটা বোঝা বা স্বীকার করার মতো ইতিহাসের পথ আজ আমরা পার করে এসেছি। কিন্তু ইতিহাস আমাদের সে পাঠ দিলেও, অন্তত গোঁড়া ভারতীয় দার্শনিকদের তরফে সে পাঠ স্বীকার করতে যথেষ্ট দ্বিধা আছে। দার্শনিকের সত্যভাবনা চঞ্চল বা ক্ষণস্থায়ী সত্যের চেয়ে ঢের ঝুঁকে থাকে অঞ্চল বা স্থায়ী সত্যের খোঁজে! বিজ্ঞানের সঙ্গে এইখানেই তার স্পষ্ট ও চওড়া ফারাক।

কিন্তু ফারাক যাই হোক, মানব সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে জানা বোঝার যে দীর্ঘ সিলসিলা, সময় সময় তার ঝাড়াই বাছাই যে অনিবার্য সে কথা অস্বীকার করার যো নেই। সত্য ভাবনার নির্বিকল্প ঘটে একসঙ্গে সব কিছুর ঠাঁই হতে পারে না!

কিন্তু আমাদের colonial দর্শন ভাবনা এমন ঝাড়াই বাছাইয়ের পথে যেতে নিতান্তই নারাজ। তাই প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক ভাবনার আজ কতটা ফেলার আর কতটা রাখার যে বিদ্যাসাগরীয় মাথাব্যথা ১৮৫৩-এ সামনে এসেছিল তাতে আমরা প্রায় কেউই সেভাবে মাথা দিইনি। এমন কথা ভাবা অন্তত সংস্কৃত পণ্ডিতদের তরফে তিনিই প্রথম তিনিই শেষ। তাঁর শিক্ষা ভাবনার উত্তরাধিকারী আর যেই হোক না কেন, আমরা কোনোভাবেই নই! খুব বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে অক্ষয় দত্ত বা তারপর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৯০২) ও তার অনেক পরে লোকায়ত দর্শন বিশেষজ্ঞ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতো হাতে গোনা জনা কয়েক ছাড়া গত প্রায় ১৭০ বছরে তেমন কেউ সার্থকভাবে এ প্রশ্নের খেই ধরেছেন বলে জানা নেই। বিদ্যাসাগরের এ প্রস্তাব আনার ৫০ বছর পর ১৯০২ সালে প্রথম প্রকাশিত History of Hindu Chemistry-তে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেদান্তের প্রভাব বিষয়ে বললেন 'The Vedanta Philosophy, as modified and expounded by Samkara, which teaches the unreality of the material world, is also to a large extent responsible for bringing the study of physical science into disrepute.'

ওই একই বইতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রায় বিদ্যাসাগরীয় মেজাজে এও বললেন, '... Among a people ridden by caste and hide-bound by the authorities and injuctions of the Vedas, Puranas and Smrities and having their intellect thus cramped and paralyzed, no Boyle could arise to lay down such sound principles for guidance as...'

বোঝাই যাচ্ছে যে, আচার্য রায় অবশ্য বেদান্ত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত সে-সব গোলমেলে বিদ্যাসাগরীয় প্রশ্নে ঢোকেননি। তাঁর বক্তব্যে এটা পরিষ্কার যে, তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বেদান্তের প্রভাব এত বেশি ছিল যে তার দীর্ঘ ছায়া এমনকী সামাজিক পরিসরেও পড়েছিল, এবং সেটা এতটাই যে গোটা ভারতীয় মন মানসিকতাই শতাব্দীর পর শতাব্দী বেদান্ত কথিত জগৎ 'মায়ায়' আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যার ফলে বিজ্ঞান চেতনা এখানে কখনো সেভাবে দাঁত ফোটাতে পারল না!!

কিন্তু একথা সত্যি বলতে কী অংশিক সত্য মাত্র। বেদান্ত কখনো এদেশে একমেবাদ্বিতীয়ম দর্শন হিসেবে প্রতিপত্তি বিস্তার করেনি। যেটুকু করেছিল সেটা মূলত শঙ্কর, মধ্ব আচার্য, নিম্বার্ক, রামানুজদের মতো সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে যেটাকে কোনোভাবেই এমন সামাজিক প্রভাব বলা যায় না যার জন্য একটা গোটা দেশ হাজার বছর ধরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

বেদান্ত বিরোধী সম্প্রদায়ও এদেশে নেহাত কম ছিল না। খোদ কাশীতে ষোড়শ শতকে ছিলেন সাংখ্য ও যোগ দর্শনে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানভিক্ষু। এই বিজ্ঞানভিক্ষু ও তাঁর শিষ্যরা কোনো দশনামী সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন না এবং এঁরা বেদান্তের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পাষণ্ড খণ্ডন গ্রন্থে বিজ্ঞানভিক্ষু শঙ্কর অনুগামীদের প্রাণভরে গালি দিয়েছেন পাষণ্ড বলে!! শঙ্করপন্থীদের বেদান্তব্রুব বলে হাসিঠাট্টাও করেছেন। হাসিঠাট্টাটাকে পাকা করতে ইনি ব্রহ্মসূত্রের ওপর বিজ্ঞানামৃত

ভাষ্যও রচনা করেছেন। বিজ্ঞান ভিক্ষুর প্রসিদ্ধ তিন শিষ্য— প্রসাদমাধব যোগী, ভাবগণেশ দীক্ষিত আর দীব্যসিংহ মিত্র গুরুর পথেই বেদান্ত বিরোধী ছিলেন।

অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে আচার্য রায় বলে নয়, বিংশ শতকের গোড়ার কলকাতায় বসে এমনটা ভেবে বসা খুব অস্বাভাবিক নয়। ততদিনে বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার প্রায় এক দশক পুরো হতে চলেছে, যে বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের প্রায় একমাত্র মুখ বলেই শুধু যে বেদান্তের জয়গান করা হয়েছে তা নয়, আরো কয়েক পা এগিয়ে বেদান্তের সঙ্গে তখনকার বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কারগুলোরও সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে বলে দাবি তোলা হয়েছে!!! ততদিনে 'প্রাচীন ভারত', 'রাষ্ট্র', 'জাতীয়তাবাদ' ইত্যাদি গুরুচণ্ডালীর নানা উত্তেজক ভাষ্য স্বাদেশিকতার সদ্যোজাত নতুন ভিয়েনে পাক হতে শুরু হয়েছে। এসব প্রাচীন ভারত কথার নবনির্মিতির সঙ্গে সংগত করতে পারে এমন দর্শন হিসাবে বেদান্ত ও গীতার নির্মাণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়া উনিশ শতকের শেষে বাংলার এমনকী বৃহত্তর সামাজিক পরিসরেও প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। বলাই বাহুল্য যে, এরকম উত্তেজক পর্বে এসব নির্মাণ বা নির্বাচন প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক বা যৌক্তিক উৎপত্তির দিকে নজর পড়ে না।

বেদান্তের নির্বাচন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে পরোক্ষভাবে জার্মান ও অন্যান্য বিদেশি পণ্ডিতদেরও যোগদান ছিল যার মধ্যে প্রধানতম অবশ্যই ম্যাক্সমুলার সাহেব। উনিশ শতকের শেষ দিকে রামকৃষ্ণ জীবনী লেখার সময় তিনি প্রায় ব্যাসদেবের জার্মান অবতার বলে চিহ্নিত! উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ জুড়ে এহেন ম্যাক্সমুলার যখন ঋগ্বেদ অনুবাদ তথা প্রাচীন ভারতের দর্শনের গড়ুড়ধ্বজ উড়িয়ে চলেছেন, ডয়সন বা থিবোর মতো পণ্ডিতরা তখন করছেন বেদান্ত বিশ্লেষণ। অবশ্য এহ বাহ্য! এর অনেক আগেই সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে স্বয়ং হেস্টিংস, উইলকিন্স, জোন্স, জোনাথন, জেমস প্রিন্সেপ, কোলব্রুকরা গীতা ও সংস্কৃত সাহিত্যে শুধু যে মজেছিলেন বললে কম বলা হবে, বলা ভালো যে তাঁরা এগুলোর পূনর্নির্মাণ শুরু করেছিলেন। এতকিছুর মধ্যে আমাদের আপাতত মাথা না দিলেও চলবে। কিন্তু শুধু এটুকু মনে রাখব যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ ও জার্মান উদ্যোগে শুরু হওয়া প্রাচ্যকে নতুনভাবে দেখার ও বোঝার যে প্রক্রিয়া, সেটা এদেশে প্রায় গোটা ঊনবিংশ জুড়ে ডালপালা মেলছিল। ঊনবিংশের শেষভাগে নানা হাতে খাড়া করা প্রাচ্যের যে চেহারাটা শেষমেষ তৈরি হল সেটা, সত্যি বলতে কী, প্রাচ্যের আমরাও তেমনভাবে জানতাম না। সেটা মূলত প্রবলভাবে পবিত্রগন্ধী আধ্যাত্মিক চাদরে মোড়া প্রাচ্য, এবং সে প্রাচ্যের প্রধান মুখ জার্মান ও ব্রিটিশ হাতে সেজে ওঠা বেদ, বেদান্ত ও গীতা।

উনিশ শতকের শেষে এই প্রাচীন ভারত ও তার নতুনভাবে চিহ্নিত উপাদানই আমরা জানি যে, স্বদেশি স্বাভিমানের প্রধান উপাদান হিসেবে নানা স্তরে কার্যকরী হচ্ছিল।

সাহেবদেরই নতুনভাবে চিনিয়ে পড়িয়ে দেওয়া নতুনভাবে পাওয়া ভারতীয় উত্তরাধিকারের ফাটা ছেঁড়া দলিল দস্তাবেজ সম্বল করেই যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শুরু সে তো বহু আলোচিত।

বেদান্ত ততদিনে ভারতের তাত্ত্বিক পরম্পরার প্রধান মুখ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে... আর এর সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটা সবে চালু হয়েছে।

অবশ্য এসবের সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ফলও অনেক কিছুই... বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তথা স্বাধীনতা..., আমাদের এ লেখার জন্য সেসব কার্যকারণ বিশ্লেষণের ভিতর ঢোকার দরকার নেই। সেসব বহু আলোচিতও বটে, মূলত ঐতিহাসিকদের কলমে। আমরা দেখেছি বিপ্লবীরা গীতা হাতে নির্ভয়ে ফাঁসি যেতেও পিছপা হয়নি। লক্ষণীয় যে বৌদ্ধ ত্রিপিটক বা কোরাণ কখনো সে ভূমিকা পালন করেনি।

মোটকথা গোটা ভারতীয় দর্শনের না হোক বেদ, বেদান্ত, গীতার একপ্রকার spiritualization ঘটছিল যেটা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে অক্ষয়বট তার শিকড়ে জল ঢালছিল। ফলে ঘটনাচক্রে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা/দর্শনের সবটাই অভ্রান্ত, অকাট্য ও এমনকী পবিত্রও হয়ে উঠল!! এমনকী খাবার হোটেল অবধি পবিত্র হিন্দু হোটেল হয়ে উঠল।

ফলে আমরা দেখছি যে টোল, চতুষ্পাঠীর ঘনিয়ে আসা সংকটকালেও মহেশ চন্দ্রের মতো মানুষ ১৮৮৫-তেও কেবলমাত্র টোলের পরিকাঠামো পালটানোর প্রস্তাব দিচ্ছেন, বিষয়বস্তু নিয়ে কদাচ নয়।

বিষয়বস্তুর ঝাড়াই বাছাই নিয়ে কথা ওঠেনি এমনকী সে সময়ের অন্যতম প্রধান শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন বলে কথিত সতীশচন্দ্র মুখার্জি পরিকল্পিত ও সম্পাদিত ডন সোসাইটির পত্রিকাতেও। ১৮৯৭-এ ডন সোসাইটির আত্মপ্রকাশ সে সময়কার নতুন জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত এক স্মরণীয় দিকচিহ্ন বলেই ভাবা হয়। সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে পরিকল্পিত এই সোসাইটির ঘোষিত কর্মপরিধি বিশাল ও ব্যাপক।

বছর পাঁচ আগে অধ্যাপক মানবেন্দ্রনাথ মিত্রের সযত্ন সম্পাদনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ১৮৯৭ থেকে ১৯১৩ অবধি একটানা বের হওয়া 'The Dawn' পত্রিকা নবকলেবরে মোট ১৬ খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

পুনর্মুদ্রিত খণ্ডগুলোয় চোখ বুলিয়ে মনে হল যে, ডনের দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছরের মুদ্রিত কর্মকাণ্ডে মহেশচন্দ্রের তথা সেই

'অকাট্য অভ্রান্ত' ভাবনারই আরো প্রকট ও প্রবল প্রতিফলন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ডনের ঐতিহাসিক ভূমিকা এই লেখায় আমাদের বিবেচ্য নয়। কিন্তু দীর্ঘ ১৬ বছরে পত্রিকায় প্রকাশিত সবসুদ্ধ প্রায় ৭০০ ছোটো বড়ো নানারকম লেখার বিষয়বস্তুতে চোখ বোলালে এটা বোঝা যায় যে, কীভাবে একটা গোটা সময়কালের ভাবনা ও আদর্শের এক হিন্দু স্বাভিমানী অহং-এর স্থিরনির্দিষ্ট একমুখী অভিমুখ তৈরি হয়ে উঠছে। ব্যক্তিবিশেষের স্বাভিমান মনস্তাত্ত্বিকভাবে একটা অনিবার্য ব্যাপার, কিন্তু একটা গোটা সমাজের নতুন স্বাভিমান মাত্রা ছাড়ালে, কিছু আশু ফল দিলেও, অনেক পরোক্ষ বিপদের বীজ বুনে দিতে পারে যা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকে। ডন সোসাইটির শিক্ষা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াকলাপের আত্মপ্রকাশ সেই পুরোনো চতুষ্পাঠী ভাবনারই অবিকৃত পরিকাঠামো ও বিষয়সূচির জঠরে! যদিও দাবি করা হয়েছে যে ভাগবত চতুষ্পাঠীর নতুন ধাঁচাটি '...were made, unlike the ancient Tols, to stimulate other lines of activity such as industrial to answer the modern needs of the country.', তবুও এই টোলে প্রথম দু বছরের ঘোষিত পাঠক্রম [2] দেখলে এই দাবির সঙ্গে একবারেই সংগতিপূর্ণ লাগে না!

১৮৯৭-এ ডন পত্রিকার আত্মপ্রকাশ মূলত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ পরিচালিত ভাগবত চতুষ্পাঠীর মুখপত্র হিসেবে, যা পরবর্তীতে ১৯০৪-এর পর The Dawn and Dawn Society's Magazine হিসেবে মূলত National Council of Education, Bengal-এর নীতি ও আদর্শের sounding board হয়ে ওঠে। ১৯০৬-এর Bengal National College, যা বর্তমানের স্বনামধন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সেটা এই উদ্যোগের এক স্থায়ী দিকচিহ্ন।

কিন্তু আমাদের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র হিসেবে ডন পত্রিকার বিষয়গত অবকাশ বা ভাগবত চতুষ্পাঠীতে পড়ার জন্য প্রস্তাবিত বিষয়সূচিতে চোখ রাখলে বুঝতে অসুবিধা হবার নয় যে, ততদিনে বিদ্যাসাগর রামমোহনের 'বিজ্ঞান পক্ষপাতদুষ্ট' শিক্ষা ভাবনা বুড়িগঙ্গার জলে তলিয়ে গেছে, যদিও ১৮৯৭-এ আত্মপ্রকাশ সংখ্যায় The Dawn নিজের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবান— 'A monthly magazine devoted to Religion Philosophy and Science!'

১৬ বছরের দীর্ঘ সময়কালে প্রকাশিত লেখাগুলির বিষয়সূচিতে আরো নির্দিষ্ট ও মনোযোগী চোখ বুলানো যাক— মাধব মিত্র সম্পাদিত পুনর্মুদ্রিত The Dawn-এর প্রথম খণ্ডে মোট ১৬ বছরে প্রকাশিত সব লেখাকে সামনে রেখে অত্যন্ত কাজের একটা বিষয়ানুগ সূচি তৈরি করেছেন অধ্যাপক হরিদাস মুখার্জি ও উমা মুখার্জি। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, Religion ও Philosophy বিষয়ক সূচিতে অন্তর্ভুক্ত লেখার সংখ্যা মোট ৭৭, Scientific শিরোনামে লেখা ৪৪, Historical-এ ১৭১, Economic-এ ১১৪, Educational-এ ১১৩, Sociological-এ ৯৮, Art Architecture-এ ৫০... দেখাই যাচ্ছে যে সবচেয়ে কম লেখা Scientific এই। বেচারা ভারতীয় বিজ্ঞান!! অথচ ১৮৯৭ থেকে ১৯১৩, ডনের পুরো আয়ুকাল পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইউরোপে এক অতীব রোমাঞ্চক ও উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায় যেমনটা আর পরে কখনো হয়নি।

ইউরোপে তখন নতুন Quantum Theory ও আইনস্টাইনের প্রস্তাবিত Special Theory of Relativity-র প্রহর গোনা শুরু হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই বিশ শতকের প্রথম দশকের সে উত্তেজনার শরিক। গণিত ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতির যুগলবন্দীতে তৈরি conceptual network-এ তখন ধরা দিচ্ছিল দৃশ্যগ্রাহ্য জগতের বাইরের সম্পূর্ণ এক অন্য জগতের খণ্ডচিত্রাবলি... যেগুলো তারপর জোড়াজুড়ির কাজ শুরু হয়...।

বিজ্ঞানের নানা শাখার মিশ্র ৪৪টি লেখার কোনোটাতেই পশ্চিমি বিজ্ঞানে এই নতুন দিগন্ত খোলার হালহদিশের ছিটেফোঁটাও নেই!

অবশ্য সেটা খুব অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, কারণ এক হাতে গীতা বা ব্রহ্মসূত্র শক্ত করে ধরা থাকলে অন্য হাতে প্রিনখিপিয়া বা নতুন বিজ্ঞানের খেই ধরা বেশ মুশকিল। Educational বিষয়সূচিতে অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ লেখার শিরোনামে তরকারিতে নুনের মতোই National শব্দটি দেখা যায়। এই সর্বাত্মক নতুন Nation ভাবনার মধ্যে খুব সম্ভবত বৌদ্ধদের কথা ভাবা হয়নি, কারণ বুদ্ধ কথা এ প্রসঙ্গে চোখে পড়ল না। Nation আর হিন্দু মিলেমিশে একাকার, আর সে হিন্দুর উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি বেদান্ত ও গীতা! আজ প্রায় শতাব্দীর ব্যবধানে বসে সে সময়টায় ফিরে দেখে বেশ কৌতুকই বোধ হয়... কালের রাজনৈতিক ডামাডোলে আমরা সবাই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নানা মাপের সাপলুডো খেলে চলি। কলোনিয়াল সাপলুডোয় কোনো একটা দর্শনের এমন বিশ্বখ্যাতি অর্জন করা ইতিহাসে প্রায় বিরল!

ভারতীয় আত্মা তথা মনকে পশ্চিমের ভাবদাসত্বে বাঁধার জন্য দায়ী মেকলে Strategy তথা তার এদেশি সহযোগী রামমোহন আর বিদ্যাসাগরের দূরভিসন্ধিমূলক শিক্ষানীতিকে ভর্ৎসনা করে সেই ১৮৯৮ এই সতীশচন্দ্র University Education system-কে একবাক্যে ব্যর্থ বলে দেগে দিচ্ছেন— 'The system of university education, such as it obtains in India at the present day has not been

altogether the success which it was expected it might be. It has failed to satisfy every one of the parties concerned.'

যার প্রতিবিধান সতীশচন্দ্রের মতে একটি 'indigenous' product which would spring up from among the people themselves to suit the necessities of their case (page 334)

পরিষ্কার করে বোঝা যায় না যে এই অসন্তুষ্ট parties ঠিক কারা এবং কেনই-বা তারা এত অসন্তুষ্ট!!! আসলে এই গোল গোল অনির্দিষ্ট কথাগুলোই ইতিহাসের খেয়ালে সময় সময় এমন মান্যতা পেয়ে যায় যে, পরে একে প্রশ্ন করতেও লোকে দশবার ভাবে।

এটা ভেবে আজ হয়রান হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই যে, কেন এত মনস্বী মেধাবী মানুষগুলো এটা বুঝতে চেষ্টা মাত্রও করলেন না যে, টোলের পরিকাঠামোর দীর্ঘ দিন টিকে থাকাটা একটা গোটা সামাজিক পরিস্থিতি বা বাস্তবতার অংশমাত্র ছিল, যে সামাজিক পরিস্থিতি পলাশির যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল..., যেটাকে মেকলের সঙ্গে মোকাবিলার ছায়াযুদ্ধের অজুহাতেও আর ফিরিয়ে আনার অসম্ভব চেষ্টা করা যায় না!!!

তাই দিনের শেষে এ ভেবে বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না যে, দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত ইতিহাসের এই গণ-ভ্রান্তপাঠ (collective misreading of History) যে বিপুল ও ব্যাপক utopia-র জন্ম দিয়েছিল, স্বাদেশিকতার উত্তেজক আঁচ ও আরো কিছু অনিবার্য byproduct ছাড়া সেটা আর কি কোনো স্থায়ী paradigm shift এর সন্ধান দিয়েছে, যেটা নাকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহুল বিজ্ঞাপিত সমন্বয়ের ঘোষিত প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল?

University-র বহু নিন্দিত পরিকাঠামো অবিচল থেকেছে আর পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তুও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমন্বয়ের কান ঘেঁষেও গেছে বলে অতি বড়ো আশাবাদীও নিশ্চয় আজ আর দাবি করবে না। গেলে আজ অবধি এদেশে অন্তত একটা দুটোও আন্তর্জাতিক মানের History and Philosophy of Science centre তৈরি হয়ে উঠত।

ইতিহাসের এই আদ্যোপান্ত ভুল পাঠের কারণ আরো বহুবিধ! সবটায় গেলে এই প্রবন্ধ মহাভারত হবে। এটুকু বলে এ লেখায় দাঁড়ি টানার দিকে যাই যে, ২০১৯-এর Digital ভারতীয় সমাজও এই প্রশ্নের মোকাবিলার ব্যর্থতা দিয়েই ডিফাইন্ড। পাড়ায় পাড়ায় ভুঁইফোড় ইউনিভার্সিটি তো গজাচ্ছেই, তাছাড়াও IISER, নতুন IIIT-র নতুন পরিকাঠামোর জোয়ার চলেছে তো চলেছেই! কিন্তু interdisciplinary course content আজ অবধি তৈরি হল না। তাই যেখানে ১৮৮০-তে গোটা নদিয়ার সব কটা টোলে মেরেকেটে ২০০ ছাত্র ছিল বলে শুনি, তার এতকাল পরেও আজ এই ২০১৯-এ অবাস্তবভাবে টোলের ঐতিহ্য বাঁচাবার অক্ষম সওয়াল শুনি। সারা বাংলায়, শুনতে গা ছমছম করে, আজও নাকি ৪০০/৫০০ টোল (নাকি তারও বেশি?) বর্তমান! সঠিক সংখ্যাটা ওয়াকিফ্‌হাল যে কয়েক জনকে জিজ্ঞাসা করলাম কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারলেন না। থাকতেও পারে! কিন্তু পড়ে কারা সে একটা রহস্য বই কী। কারণ জ্ঞানত আমি আজ অবধি এমন কোনো অভিভাবককে দেখিনি যার ইচ্ছা তার সন্তান টোলে পড়ুক। তবে পড়ে কারা!!! পড়ায় কারা বা পড়েই বা কী তার একটা উত্তর হয়তো খাপছাড়াভাবে পাওয়াও যেতে পারে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সে পাঠক্রম 'আধুনিক' বা এমনকী সাম্প্রতিক জীবন মননের চাহিদার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্য বা সংগতিপূর্ণ সে নিয়ে প্রবল সন্দেহ থেকেই যায়।

তবে টোলের মতো একটা সমান্তরাল শিক্ষাসত্রকে উদ্দেশ্যহীনভাবে টিকিয়ে রেখে কোন উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে যা বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর আওতার মধ্যে সম্ভবপর নয়!!!

এ মহতি প্রশ্নের উত্তর গত দেড়শো বছরেও তৈরি হল না এবং হবে যে সে লক্ষণও যে দেখা যাচ্ছে এমন নয়। মাঝে মাঝেই বিস্মৃতির অতল গভীর থেকে ভেসে ওঠে টোলশিক্ষার জন্য কাগুজে উদ্বেগ। অবশ্যই এই দেশের উপনিবেশ-পরবর্তী (পোস্ট কলোনিয়াল) সাড়েবত্রিশভাজার পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলোর এমনকী উপক্রমণিকারও খসড়া করা গেছে বা যাবে বলে ভাবার কারণ নেই। কারণ বিবিধ, এবং এই লেখার স্বল্প অবকাশে সে বিশদে গেলে নতুন করে টুলো মহাভারত হবে।

কিন্তু সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ প্রশ্নের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য যে উত্তর তা এমনকিছু সহযোগী প্রশ্নের (collateral questions) উপর নির্ভর করে, যার উত্তর সত্যিই নিশ্চিতভাবে আমাদের জানা নেই, কারণ আমরা সে প্রশ্নগুলো সরাসরি অ্যাড্রেস করতে আজও বেশ অস্বস্তি বোধ করি।

সহযোগী প্রশ্নগুলো হল— যেমন, আধুনিক ভারতীয় দর্শন কতটা আধুনিক? তা কি সেই পুরোনোকেই নতুনভাবে বলার এক 'colonially inspired' প্রচেষ্টা মাত্র, নাকি তা সত্যিই নতুন কোনো দিশার খোঁজ দেবার সম্ভাবনা তৈরি করেছে?

এ ছাড়াও প্রশ্ন এটাও যে, দর্শন হোক বা বিজ্ঞান— সে শিক্ষা টোলেই হোক বা যে-কোনো আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রশ্ন যদি হয় এ জগৎজীবন সংক্রান্ত আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য

আয়ত্ত করা, তবে কি একথা অস্বীকার করা যাবে যে, একদা যে প্রশ্নগুলো আমাদের দার্শনিক পূর্বজদের ভাবিয়েছিল তার একটা বড়ো অংশেরই 'উত্তর' (হতে পারে তা provisional...) আজ আমরা বিজ্ঞানের সূত্রে আরো বিশদভাবেই জানি। অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়।

তবে কেন আজ আমাদের আলাদা করে টোলের ঐতিহ্যের দ্বারস্থ হতে হবে, college, university-র চালু পরিকাঠামো ছেড়ে!! এ প্রশ্নের উত্তর তো দূরের কথা, ভারতীয় দার্শনিক পরম্পরার গোঁড়া অন্দরমহলে এ প্রশ্নটা একেবারেই সরাসরিভাবে করা হয়ে ওঠে না। তাই প্রাচ্যের পুরোনো দর্শনের কতটা আর নতুন বিজ্ঞানের কতটা নিয়ে তৈরি হওয়া উচিত ছিল এক সমন্বিত (integrative) পাঠক্রম, সে প্রশ্নটা আজও অমীমাংসিতই রইল। আজ টুলো মহাভারতের মুষল পর্বে সে সম্ভাবনা আরো ক্ষীণ লাগে যদিও কেবলমাত্র তার মধ্যে দিয়েই নতুন ভবিষ্যতের ভাব কাঠামো তৈরি করা যেতে পারত। ভাবনার ইতিহাসে তুলনামূলক চর্চার একটা স্বতন্ত্র গুরুত্ব তো সবসময়েই আছে। কিন্তু সেটাও ঠিকভাবে তখনই করা যেতে পারে যদি মনে রাখি যে, ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রয়োজন নিশ্চয়ই, কারণ তা আমাদের অস্মিতায় রসদ জোগায়, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন ঐতিহ্যপ্রেম যদি গোটা বর্তমানটাকেই খাটো করে দেখাতে থাকে, তবে বুঝতে হবে ইতিহাস পাঠে আমাদের আপাদমস্তক গলদ আছে যা আমরা হয়তো জেনেও শোধরাতে চাইছি না!

আসলে খুঁজলে সরষের মধ্যেও আরো অনেকরকম ভূতের দেখা পাওয়া যায়! কিন্তু সে ভূতেদের গল্প আবার অন্য কোনো অবকাশে জমিয়ে বলার ইচ্ছা থাকল।

সূত্র

৭. সরোজ দত্ত, রচনাবলী

৮. ''আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপক দিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃতব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভালো বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না— 'খদির' বলিতেন। কদাচ 'চিনি' বলিতেন না— 'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্যই' বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘৃতে' নামিতেন। 'চুল', বলা হইবে না, 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না— 'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া দই চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আসিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুদের অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাহাদের লিখিত বাঙালাভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোনো গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙালা সাহিত্যের কোনো শ্রীবৃদ্ধি হইত না। এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল...'' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান।

যে বইগুলির সাহায্য নিয়েছি :

১. সংস্কৃতকলেজের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৮-১৮৯৫, কলকাতা সংস্কৃতমহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা; গোপিকামোহন ভট্টাচার্য

২. বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, প্রথম খণ্ড, পরমেশ আচার্য, অনুষ্টুপ, ১৯৮৯

৩. Adam's Report of the state of Education in Bengal, Section VII, The District of Nadia

৪. নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের ইতিহাস, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, নদীয়া, ২০১৬

৫. The Dawn, devoted to Religion, Philosophy and Science, Vol I, March 1897-Feb 1898
Reprinted volumes edited by Madhabendranath Mitra
J U in association with National Council of Education, Bengal

সত্তর থেকে কুড়িকুড়ি

শুভময় মৈত্র

বাংলার ইতিহাসে সত্তরের দশক অনেক বেশি খ্যাত। আলাদা করে আর 'উনিশশো'-টা মনে করিয়ে দিতে হয় না। তবে একে কতটা বিখ্যাত আর কতটা কুখ্যাত বলা যাবে সে নিয়ে তর্ক হতেই পারে। সোজা কথায় সত্তরের দশক অনেক বেশি উত্তাল। সে নকশাল আন্দোলন হোক, অথবা বাহাত্তরের বুথদখল, জরুরি অবস্থা কিংবা সাতাত্তরে বামফ্রন্টের বিপুল জয়। কিন্তু কুড়ি-কুড়িতে যাঁরা পঞ্চাশ হচ্ছেন, তাঁরা বেশিরভাগই খুব ছোটো ছিলেন সত্তরের সীমানায়। তাঁদের শিশু থেকে কৈশোরে পদার্পণ আশির দশকে। যা কিনা সত্তরের আগুনের সময়ের তুলনায় এ বাংলায় নিতান্ত আমপানার শরবত। সময়ের সারণিতে সত্তর দশকের দামালপনার কাছে আশি এক কোণঠাসা ছোটোভাই। তবু আজকে যাঁরা পঞ্চাশ হচ্ছেন তাঁদের কাছে আশির দশক অনেক বেশি পরিচিত। পঞ্চাশে পৌঁছে আশির দশক ফিরে দেখার একটা বড়ো অংশ আমাদের স্কুল কলেজের গল্প। এ লেখায় তাই অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি। নাবালক তখন আর বালক নয়, প্রাথমিক পেরিয়ে মাধ্যমিক। আমার মতোই যাঁরা সত্তর সালে জন্মেছেন, তাঁদের সুবর্ণ জয়ন্তীর অভিনন্দন এই লেখায়। সঙ্গে রইল সকলের ফিরে পাওয়া কৈশোর, নামগুলো একটু অদলবদল করে দিয়ে। পরে না হয় ফিরে আসা যাবে উচ্চ মাধ্যমিকে।

অষ্টম শ্রেণি— বিজ্ঞানের ঈশ্বর

মাধ্যমিক পাশ করতে গেলে কিছু বিজ্ঞান তো পড়তেই হবে। বিজ্ঞানের পরিচিত সূত্রগুলির মধ্যে বোধহয় নিউটনের গতি সংক্রান্ত তিনটি সূত্র সবথেকে এগিয়ে থাকবে। বাহির হইতে প্রযুক্ত বলের সাহায্যে অবস্থার পরিবর্তন না করলে ঠিক কী কী হয় থেকে শেষ পর্যন্ত বন্ধুর সঙ্গে তুমুল মারামারিতে প্রতিটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া বুঝতে বুঝতেই পরীক্ষা চলে আসত শীতকালে। তখন ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা হত আর এই সূত্রগুলো প্রশ্নপত্রে দাঁতনখ বার করে তেড়ে আসবেই। মাত্র কয়েকটা তো বাক্য, কিন্তু সেটুকুই মুখস্ত করতে হিমশিম। আরে বাবা, বাহির হইতে বল প্রয়োগ তো সবসময়ই হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সেটা না হলে কী হত সেটা জেনে লাভটা কী? ভরবেগের পরিবর্তন কার সঙ্গে সমানুপাতে পরিবর্তিত হয় সেটা জেনে কে কবে বড়োলোক হয়েছে? যাই হোক, আমাদের মতো ফেলটুসদের মুশকিল আসান ছিল নোংরা বাথরুম। যেখানে সাধারণ ক্লাসের দিনগুলোতে আমরা ঢুকতাম না। ছোটোখাটো প্রয়োজনে স্কুলের পাশের মাঠেই চলে যেতাম পাঁচিল টপকে। কিন্তু পরীক্ষার দিনগুলিতে সেই বাথরুমই যেন চিরন্তন ছাত্রবন্ধু। পরীক্ষার সময়টুকু এই তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার জন্যে যেরকম লাইন পড়ত তার সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা যায় অমিতাভ বচ্চনের ছবির প্রথম শো-এর। সারা বছর সুস্থ থাকা ছাত্রবৃন্দ তখন বহুমূত্রের রুগি। বাথরুমের দেওয়ালে মিলে যেত অনেক প্রশ্নের সমাধান। দেখা হয়ে যেত অন্য ঘরে বসে পরীক্ষা দেওয়া দু-একজন বন্ধুর সঙ্গেও। তিরিশে পাশ ছিল তখন। বাথরুম থেকে প্রতিবারে জোগাড় হয়ে যেত মোটামুটি দশের মতো রসদ। সাধারণভাবে একবারের বেশি যাওয়া যেত না। ফলে বাকি কুড়ি নিজের জ্ঞান, সামনে তাকানো, আর ঘাড় ঘোরানো।

যে ঘটনার কথা লিখছি তখন আমরা ক্লাস এইটে। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ছিল সকালের স্কুল, সিক্স থেকে দুপুর। ফলে আমরা তখন নীচের দুটো ক্লাসের ছাত্রদের ওপর কিছুটা দাদাগিরি দেখাতে শুরু করেছি। পরীক্ষার ঠিক কয়েকদিন আগে যথারীতি বাথরুম অভিযান শুরু করলাম। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে খোঁজা শুরু হল দেওয়ালের গায়ে কোথায় কী দরকারি জিনিস লেখা আছে। তৈরি হল তার সূচিপত্র। যেগুলো পাওয়া গেল না সেরকম দু-একটা বিষয়ও নতুন করে দেওয়াল-লিখনের অংশ হল। ছোটো বাথরুমের জন্যে সারি দিয়ে চারটে জায়গা ছিল, আর তার উলটোদিকে দুটো দরজা দেওয়া বড়ো। ছোটোগুলোর সামনে যাও বা নাক চেপে দাঁড়ানো যেত, বড়োগুলোতে নাক আটকে কোনো লাভ হত না। কারণ সেক্ষেত্রে চোখ বন্ধ রাখাটাও খুব জরুরি ছিল। কিন্তু চোখ বন্ধ করে লিখলে তো কোথায় কী আছে সেই সূচিপত্র বানানো

সম্ভব নয়। তাই সারা বছর পড়াশোনা না করার পরে নম্বরের কেষ্টর জন্যে কিছুটা কষ্ট করতেই হত। টেনিদা ছাড়া কে আর এক ক্লাসে বছর বছর থাকতে চায়?

কোনো কারণে নিউটনের তিনটে সূত্র আগে কোথায় লেখা ছিল সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে সেগুলো একটা জায়গায় নতুন করে লিখতেই হল। সেই লেখা যখন চলছে সেই সময় সে বছর সদ্য দুপুরে উত্তীর্ণ হওয়া এক ক্লাস সিক্সের ছাত্র উঁকি দিল বাথরুমে। 'তোর এখানে কী চাই?', চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমরা। পাশ থেকে আমাদের পালের গোদা সায়ন তার মাথায় মারল এক চাঁটি। তাতে একটুও ঘাবড়াল না সেই একরত্তি ছেলে। পরে জেনেছিলাম তার নাম দীপাঞ্জন। চট করে আমাদের হাতে একটা-দুটো হজমি গুলি গুঁজে ব্যাপারটা সামলে নিল সে। সুদীপ্ত তো সেই দুর্গন্ধের মধ্যেই তার ভাগেরটা মুখে পুরে অন্যদেরগুলো বাগানোর চেষ্টা শুরু করল। দীপাঞ্জনের চাহিদা সামান্যই, 'বুঝলে দাদা, আমার ইতিহাসে একটু গণ্ডগোল আছে। তাই দেওয়ালে দু-একটা সাল-তারিখ লিখতাম। তোমাদের আপত্তি নেই নিশ্চয়।' ক্ষমাশীল দাদা হিসেবে অনুমতি দিলাম। তারপর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হল ভালোভাবেই। প্রতিটি বিষয়ে তিরিশ চল্লিশের মতো নম্বর পেয়ে নাইনে উঠলাম আমরা।

নাইনের প্রথম দিন ভৌত বিজ্ঞানের ক্লাসে এলেন সুব্রতবাবু। সঙ্গে বেশ কয়েকটা পরীক্ষার খাতা। বছর শুরুর প্রথম দিনে গত বছরের বার্ষিক পরীক্ষার খাতা হাতে শিক্ষক! আগে কখনো এমন দেখিনি। নাম ধরে ডেকে আমাদের মতো জনা আটেক শেষ বেঞ্চের পড়ুয়াকে দাঁড় করালেন তিনি। রীতিমতো হুংকার দিলেন, 'কী লিখেছিস নিউটনের প্রথম সূত্রে?' কী লিখেছি সেটা তখন আমাদের মতো গুণধরদের মনে আসা মুশকিল। তাই কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। বোবার শত্রু নেই। 'শোন কী লিখেছিস', বলে আমাদের একজনের খাতা খুলে পড়তে শুরু করলেন চোখে ভারী চশমা পরিহিত রোগাসোগা মাস্টার। 'ব্রহ্মগুপ্ত বাহির হইতে প্রযুক্ত বলের দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন না করিলে কুরুক্ষেত্রের স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকিবে এবং চলমান বস্তু চিরকাল সমদ্রুতিতে সরলরেখায় হস্তিনানগরের দিকে চলিতে থাকিবে।' কান ধরে নিলডাউন হতে হল। গার্জেন কল বাদ গেল না। আমাদের অভিভাবকরা যে খুব বিজ্ঞান জানতেন এমন নয়। তবে এটুকু বুঝলেন যে কিছু একটা গভীর গোলমাল হয়েছে। ফলস্বরূপ বাড়িতেও পিঠে পড়ল কয়েক ঘা।

অনেক অনুসন্ধান করে শেষ পর্যন্ত আসামি ধরা পড়েছিল। ক্লাস সিক্সের দীপাঞ্জন। ইতিহাস লেখার জন্যে ঠিকঠাক জায়গা না পেয়ে নিউটনের সূত্রের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন নাম-ধাম, সাল-তারিখ মিশিয়ে দিয়েছিল বিচ্ছুটা। পরীক্ষার প্রথম ঘণ্টা পড়তেই বাথরুম অভিযান এবং দেওয়াল থেকে ভালোভাবেই প্রথম সূত্র মুখস্থ করে ফিরে এসেছিল সঞ্জীব। তার থেকেই পরপর টুকেছিলাম আমরা। সেই টুকলি সারির মাঝে ছিলাম আমিও। একবার মৃদু প্রতিবাদ করার চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু আমার সামনে বসে থাকা রণেন্দ্র এক ধমক দিয়ে বলল, 'বাজে বকিস না। কে বলেছে যে ব্রহ্মগুপ্ত বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করতে পারে না? কুরুক্ষেত্রে কি বস্তু নেই? সেখান থেকে কি সরলরেখায় হস্তিনানগর যাওয়া যায় না? টুকতে হলে টোক, নইলে নিজে লেখ।' এর মধ্যে পেছন থেকে অরূপ খোঁচাতে শুরু করেছে। 'কী হল দেরি করছিস কেন? তাড়াতাড়ি টোক। পাশটা তো করতে হবে।' সেই সময় অবশ্যই নিজের থেকে বন্ধুদের ওপর বিশ্বাস ছিল অনেক বেশি। তাই আর উচ্চবাচ্য না করে যা সামনে পেয়েছি সেটাই টুকে দিলাম।

সে ঘটনা আশির দশকের শুরুতে। তারপর তিন দশকের বেশি কেটে গেছে। ২০১৮ সালের ৯ জানুয়ারি শুনলাম বিজেপি শাসিত রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী বাসুদেব দেবনানি বলেছেন নিউটনের প্রায় এক হাজার বছর আগে মাধ্যাকর্ষণের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন দ্বিতীয় ব্রহ্মগুপ্ত। সময়ের ঘড়িটাকে পেছোতে পারলে সে বছর তিরিশ থেকে দু-নম্বর বাড়ত আমার ভৌত বিজ্ঞানের নম্বর। সুব্রতবাবু টেনে থাপ্পড় মেরে বলেছিলেন, 'তোদের দেখলে নিউটনের ভূত ভয়ে পালাবে।' স্যার এখন কোথায় জানা নেই। জানি না তিনি বাসুদেব মশাইয়ের মন্তব্য শুনেছেন কিনা। শুনলে হয়তো বিড়বিড় করে বলতেন, 'নিউটন ভূত হয়েছেন, আর ব্রহ্মগুপ্ত ভগবান'।

নবম শ্রেণি— জ্যামিতি

আশির দশকের গল্পে জ্যামিতি নেই তা হতেই পারে না। আসলে সুদূর অতীতে সেই ইউক্লিডের সময় থেকে যে যন্ত্রণার শুরু, তা হঠাৎ করে আশিতে আসবে না এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। আর তাই যুগযুগান্তরের অসহায়তা আশির দশকেও প্রচুর পড়ুয়ার ঘুম কেড়েছিল। আগুন আবিষ্কার অবধি ঠিক ছিল, কিন্তু কোন দুঃখে যে জ্যামিতি নামক এক বিষয়ের আবির্ভাব হল সে আলোচনা কোনোদিন শেষ হবে না। তবে চুরাশি সালে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় 'এসকেপি একটি ত্রিভুজ' নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল তা ওপর থেকে দেখে থাকলে ইউক্লিড সাহেবও চমকে উঠতেন। গল্পটা এখানেই বলে নেওয়া যেত, কিন্তু বিদগ্ধ এক সাংবাদিক বন্ধু বারণ করেছে। সে বলেছে সাসপেন্স তৈরি করতে। না হলে নাকি পাঠিকাদের (আসলে পাঠকদের নিয়ে আমার সাংবাদিক বন্ধু একদমই উৎসাহী নন) দৃষ্টি আকর্ষণ করা অসম্ভব। সাসপেন্সের বাংলা মানে যদি

উৎকণ্ঠা হয়, তা হলে আমি যে লিখছি এতেই অনেক লোক ভীষণ উৎকণ্ঠিত। হয়তো বেশ কিছুটা লিখে ফেলেছি। পরিবারের কোনো এক আত্মার আত্মীয়কে বললাম একটু পড়ে কেমন লাগছে বলতে। সে নিশ্চিন্তে বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। কিন্তু লেখা পড়তে হবে শুনেই লাফিয়ে উঠে চানঘরের দিকে ছুটল, তার নাকি কাল রাতে গুরুভোজন করে পেটের গোলমাল। বাড়িতে জনে জনে জিজ্ঞেস করেও কোনো সহযোগিতার চিহ্নমাত্র নেই। শেষে বাজারে যাওয়ার সময় লেখাটা পকেটে নিয়ে বেরিয়েছি। চায়ের দোকানে বসে বিশুকে একটা এস্পেশাল দিতে বললাম। এমনিতে চারটাকা, কিন্তু বিশুর মনোরঞ্জনের জন্যে ছ-টাকা খরচ করতে আমি রাজি। যদি একবার কাজের ফাঁকে বিশুকে লেখাটা পড়ে শোনানো যায়। কিন্তু বিশুর মেজাজও আজকে তিরিক্ষি। 'এস্পেশাল হবে না, আর একশো টাকা দিলেও আমার এখন আপনার ছাইভস্ম শোনার সময় নেই।' ঘরে-বাইরে বড়োরা পাত্তা দিচ্ছে না, তাই ছোটো হলেও চলবে। বাড়িতে ছোটোগুলোর পড়াশোনার নামগন্ধ নেই। সারাদিন হইহুল্লোড়। তাদের হাতে লজেন্স ধরিয়ে দিতেই তারা কেমন সন্দেহের চোখে তাকাল। তারপর আমার লেখার কথা উঠতেই গত সাতদিন বই না খোলা শিশুকুল একছুটে পড়ার ঘরে ঢুকে পড়ে নামতা মুখস্ত করতে শুরু করে দিল। ফলে এই লেখা একেবারে 'আনকাট'। তাই আশির দশকের গল্পে ধীরে ধীরে সাসপেন্স তৈরি করার দরকার নেই, পাঠিকারা এই লেখা পড়তে হবে ভেবেই যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হবেন।

পড়াশোনা করলেই জ্যামিতি আসবে। আর আশির দশক থেকে শুরু করে গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে যতজন মাধ্যমিকে জ্যামিতির অত্যাচার সহ্য করেছেন তার সংখ্যা চোখ বুজে দু কোটির বেশি। সুমন তাদেরই একজন। সুমনকুমার পাল। আমাদের এক ক্লাসের বন্ধু। অঙ্কে মস্তান, জ্যামিতিতে জাদুকর। আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই সুদিনকৃষ্ণ পান। অতিপরিচিত এসকেপি। সব সময় মুখে মিষ্টি পান। মানুষ অসাধারণ, অঙ্ক শেখান তার থেকেও ভালো। কিন্তু প্রতিবার পরীক্ষার খাতা বেরোনোর সময় শিরদাঁড়ায় শিহরন বইয়ে দেন। তার কারণ পরীক্ষার খাতায় তিরিশ পেতে গেলেই অনেক রক্ত, অনেক ঘাম ঝরাতে হয়। তাঁর মূল্যায়নে আঠেরো পেয়ে শিখেছি যে 'সামন্তরিক' আসলে 'সামান্তরিক'। ত্রিভুজ বানানে বেশি ভালো করতে গিয়ে দীর্ঘ-ঊ বসিয়ে দিলে সুদিনবাবু নিশ্চিন্তে গোটা অঙ্কে শূন্য বসিয়ে দেন। আদর করে উনি বলেন 'জূন্য', ইংরেজির জিরো আর বাংলার শূন্য মিলেমিশে একাকার হলে নাকি এই বিশেষ সংখ্যাটার জোর অনেক বেড়ে যায়। আমাদের ক্লাসের ভালো ছেলে সুমন। এসকেপির অতি প্রিয় ছাত্র। বাকি সবাই যখন তিরিশ পেতে হিমশিম, তখন সে অনেক দূরের পঞ্চান্ন। প্রতিবারই সুমন এরকম নম্বর পায়, আর প্রিয় ছাত্রের দিকে মিষ্টি হেসে স্যার বলেন, 'এ ছেলে বার বার আমার হাতে পঞ্চাশের বেশি পাচ্ছে। মাধ্যমিকে এর একশোয় একশো কেউ আটকাতে পারবে না।' কিন্তু এবার স্যারের মুখ থমথমে। ষাণ্মাষিক পরীক্ষার খাতা দেওয়া শেষ। আমি আমার আঠারোকে একটু বাড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে আর একটা অঙ্কের বানান ভুল খুঁজে পেলেন স্যার। আরো পাঁচ বাদ। ভাগ্যহীনের হাতে রইল তেরো। বাকিদের অবস্থাও তথৈবচ। একটাই সান্ত্বনা যে বার্ষিক পরীক্ষায় সুদিনবাবু সবাইকে তিরিশ দিয়ে লালদাগের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেন। কিন্তু স্যারের মুখ আজ এত গম্ভীর কেন? ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়বে পড়বে করছে। হাত নাড়িয়ে সুমনকে কাছে ডাকলেন এসকেপি। সুমন কাছে যেতেই টেনে গালে এক চড়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুমন কিছু বোঝার আগেই অন্য গালে আর একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়। তারপর শান্ত মাস্টারের বজ্রনির্ঘোষ। 'আমি একটা ত্রিভুজ? ছি! ছি! কী দিন এল? শুধু পড়াশোনায় ভালো হলে হয় না, মানুষ হতে হয়।' ঘণ্টা বেজে গেল। হনহন করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন স্যার। সুমনের থেকেও বেশি হতভম্ব আমরা। ব্যাপারটা বুঝতে গোটা ক্লাসের সেদিন বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। এসকেপি প্রমাণ করতে দিয়েছিলেন যে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ। সেই প্রমাণ লিখতে গিয়ে সুমন প্রথমেই লিখেছিল 'ধরা যাক এসকেপি একটি ত্রিভুজ'। আমরা সবাই যখন ত্রিভুজের নাম দিতাম এবিসি, তখন সুমন কায়দা করে অন্য তিনটে অক্ষর ব্যবহার করে ফেলেছিল। তবে মোটেই স্যারের পিছনে লাগার জন্যে নয়। তার নিজের নামের আদ্যক্ষরগুলোকে ধরলেও এসকেপি হয়। পরের দিন স্যার ক্লাসে এলে সুমন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা সবাই মিলে স্যারকে বোঝাতে পেরেছিলাম আসল ঘটনাটা। স্যার এসে হাত দিলেন সুমনের মাথায়। ডেস্কের ওপরে অঙ্ক খাতার আঁকিবুকি জেবড়ে গেছিল ছাত্র আর মাস্টারের চোখের জলের ফোঁটায়। সারা ক্লাস নিশ্চুপ। চোখের জলের ফোঁটার সংখ্যা গোনা হয়ে ওঠেনি সেদিন। তবে আজও মনে পড়ে যে আশির দশকে আমাদের সুদিন ছিলেন।

সুমন এখন অঙ্কের বিরাট গবেষক। দুনিয়াজোড়া নামডাক। তার কাজ নাকি জ্যামিতি নিয়েই। সারাক্ষণ উড়োজাহাজে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ায়। বন্ধুরা বলে 'তুই তো চেয়ারের থেকে এয়ারেই বেশি থাকিস।' মাঝরাতে কলকাতার আকাশে চক্কর খায় উড়োজাহাজ। জানলার পাশে বসে চেনা শহরের বিন্দু বিন্দু আলোর ঝিকমিক দেখে সুমন। সেগুলোকে জুড়ে দিলে কত রেখা, কত বৃত্ত, কত ত্রিভুজ। কল্পনায় জ্যামিতি গিজগিজ

করে সুমনের উর্বর মস্তিষ্কে। হঠাৎ একগাদা মেঘ চলে আসে নীচে। শহর দেখা যায় না তখন, পুরোটাই অন্ধকার। কিন্তু ওপরের তারাগুলো তখনও থেকে যায়। সেখান থেকে আঙুল বাড়ান এসকেপি। উড়োজাহাজের জানলার বাইরে সেই আঙুল এসে ঠেকে। উড়োজাহাজের ভেতরের সুমন এখন ছাত্র থেকে মাস্টার, সুমনকুমার পাল থেকে ছোটো হয়ে এসকেপি। সুমনও আঙুল ঠেকায় উড়োজাহাজের জানলায়। আঙুল দুটোয় ছোঁয়া লাগে কিনা বোঝা খুব মুশকিল। আশির দশক থেকে ফিরে আসা দুটো আঙুল, দুটোই এসকেপির।

দশম শ্রেণি— মাধ্যমিকের আগে

ছিয়াশি সালের শুরু। আর কিছুদিন পরেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। লেকটাউনে তখন সবে ফ্ল্যাট ওঠা শুরু হচ্ছে। তার আগে অবধি আমাদের রাজ্যে বেসরকারি ফ্ল্যাট বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি। যদিও সরকারি আবাসন কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই আমাদের রাজ্যে তৈরি হতে শুরু করেছিল। পাতিপুকুর অঞ্চলেই ছিল একটা বেশ বড়ো আবাসন। মধ্যবিত্ত সরকারি কর্মীদের। প্রায় হাজার খানেক পরিবার থাকতেন সেখানে, এখনও থাকেন। তবে তখন এই আবাসনগুলোর বেশ রমরমা ছিল। নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তের তখন কিছুটা হলেও বিত্ত ছিল। আজকের মতো বড়োলোক আর গরিবের মাঝে চিঁড়েচ্যাপটা অবস্থা হয়নি। সঠিক পরিষেবার অভাবে এই সমস্ত আবাসনগুলো ধীরে ধীরে জৌলুস হারিয়েছে। তখন এইসব আবাসনে নিয়মিত নাটক, গান, আবৃত্তির অনুষ্ঠান হত। শীতের শেষে অবশ্যই একটা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ভরা বর্ষায় কাদা মাখামাখি ফুটবল, আর শীতের ক্রিকেট। সাধারণভাবে ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যেত। ফলে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি চুটিয়ে ক্রিকেট। ছুটির দিনগুলোতে দুভাগে খেলা হত। সকালে জলখাবার খেয়ে পাড়ার মাঠে, নিজেদের মধ্যে। তারপর কোনোমতে নাওয়া-খাওয়া সেরে দুপুরের এপাড়া বেপাড়ায় ম্যাচ। উত্তেজনা কিছু কম ছিল না, আর ইতিহাস যদি সত্যি কথা বলে তা হলে আজকের কুড়ি-কুড়ির শুরু সেই আশির দশকেই। শুধু কলকাতায় নয়, এই বাংলার সব মফস্বল শহরেই সেই সময় থেকে শুরু হয়ে গেছিল পনেরো বা কুড়ি ওভারের চটজলদি ক্রিকেট।

প্রতি বছরই কেউ-না-কেউ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। সে বছর আমাদের মাধ্যমিক। যদিও ছুটির দিনে ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়নি। তবে সপ্তাহের অন্যান্য দিন যেমন ক্লাস থাকত, তেমন আর ছিল না। ডিসেম্বরে টেস্ট পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আর সেভাবে স্কুলে যেতে হত না। টেস্টের বাংলা হল পরীক্ষা, তবু কীভাবে যেন 'টেস্ট পরীক্ষা' সেই সময় আমাদের অভিধানে ঢুকে গেছিল। আমরা ইতিহাস ভূগোল টিউশন পড়তে যেতাম অজয়বাবুর কাছে। পাতিপুকুর ফাঁড়ি অ্যার দমদম রেল স্টেশনের মাঝে। মাইনে মাসে পঞ্চাশ, না দিলেও মাস্টারমশাই মুখ ফুটে কিছু বলতেন না। রোজ একগাদা করে চপ মিষ্টি খাওয়াতেন। আমাদের টেস্টের পর থেকে আর ওনার বাড়িতে পড়া হত না, যেতে হত সবুজের বাড়ি। আমাদের স্কুল ছিল বাঙুরে। পাতিপুকুর, লেকটাউন পেরিয়ে দমদম এয়ারপোর্টের দিকে এগোলে আপনি আজও নিশ্চিন্তে বাঙুরে পৌঁছে যাবেন। ভিআইপি রোডের পাশেই অতিপরিচিত স্কুল। স্কুলের কাছেই সবুজের বাড়ি। সবুজ সেন। চেহারায় অমিতাভ বচ্চন। মনের দিক থেকে বচ্চন সাহেব 'আনন্দ' সিনেমায় যেরকম বিন্দাস, সবুজ বাস্তবেই তাই। সবুজের বাড়িতে নিয়মিত পরীক্ষা দিতে যেতাম আমরা। বিশাল তিনতলা বাড়ি, আমাদের কাছে ছিল রাজপ্রাসাদের মতো। বড়ো লোহার গেট খুলে গাড়িবারান্দা দিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির অল্প কয়েকটা ধাপ। সেটা দিয়ে উঠে একতলার আলোআঁধারি ঘর। শীতের দুপুরে আলো জ্বালিয়ে পড়াশোনা করতে হত। স্যার স্কুল থেকে টুক করে একবার বেরিয়ে এসে আমাদের প্রশ্নপত্র দিয়ে যেতেন। পাহারা দিতেন সবুজের মা। তবে সংসারের সবদিক সামলে। আর সেই ফাঁকে অন্যের খাতা দেখে অনেকটা কাজ সেরে ফেলতাম আমরা। মাঝে মাঝে বইও খুলে ফেলা হত। ফলে অজয়বাবু আমাদের উত্তর দেখে বেশ খুশিই হতেন। তবে মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাতেও ভুলতেন না।

এমন একটা ইতিহাস পরীক্ষার দিন। ফেব্রুয়ারি ৩, ১৯৮৬। বেলা একটায় সবুজের বাড়ি পৌঁছে গেছি। ঠিক সময়ে এসে প্রশ্নপত্র দিয়ে গেলেন স্যার। সবুজের মা গম্ভীর গলায় সাবধান করে দিলেন, 'কেউ কথা বলবে না। আমি কয়েকটা কাজ সেরে আসছি।' তিনি চলে যেতেই রাজুর এক লাফ। তাড়াতাড়ি চল, আজকে একটার সময় পোপ জন পল (দ্বিতীয়) দমদম এয়ারপোর্টে আসবে। সেখান থেকে খোলা গাড়িতে হাত নাড়তে নাড়তে ভিআইপি রোড হয়ে কলকাতার দিকে যাবে। দেখা করবে মাদার টেরেসার সঙ্গে। এ সুযোগ আর কখনো পাওয়া যাবে না। লাফিয়ে উঠলাম আমরা পাঁচজন। এক দৌড়ে তিন মিনিটের মধ্যে বড়ো রাস্তা পার হয়ে কেষ্টপুর খালের ধারে। রাস্তায় শুধু আমরা একা নই। আরো প্রায় জনা পঞ্চাশ লোক। দাঁড়িয়েই আছি, এদিকে পোপের দেখা নেই। সবুজের বাড়িতে কিছু বলে আসা হয়নি। সে সময়টা মোবাইল ফোন শুধু কল্পবিজ্ঞানের পাতায়। আমি একবার মিনমিন করে বললাম যে মাসিমাকে তো বলে আসা হয়নি। রাজু কোনো পাত্তাই দিল না। আবার কিছুক্ষণ পরে আমার ঘ্যানঘ্যান। এবার সবুজের ধমক। 'তোর মাসিমা হতে পারে, কিন্তু আমার তো মা। ব্যাপারটা আমিই সামলাব। প্রায় দুটো যখন বাজতে চলল, তখন আমার

পোপ দেখার ইচ্ছে ঘুচে গেছে। আর ঠিক সেই সময়ই একগাদা গাড়ির পোঁ পোঁ শব্দ। খোলা গাড়িতে চেপে ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি ঝুলিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন পোপ। আর তার চেয়েও বেশি জোরে আমরা দৌড়ে ফেরত এলাম সবুজের বাড়িতে। দোতলার বারান্দায় রেগে আগুন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সবুজের মা, পোপের মতোই ফর্সা আর রাগে গালদুটো পোপের মতোই লালচে। কোথায় গেছি জেনে নিয়ে কোনো কথা না বলে ফিরে গেলেন ভেতরে।

তিন ঘণ্টার পরীক্ষা দু ঘণ্টায় দিলে যা হয়, তাই হল। সবার নম্বর পঞ্চাশের নীচে। হঠাৎ ছাত্রদের এরকম অবনতি দেখে উদ্বিগ্ন অজয়বাবু কথা বলতে গেলেন সবুজের মায়ের সঙ্গে। আমরা ভয়ে কাঠ। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন অজয়বাবু। মুখে চওড়া হাসি। আর তার পরেই মাসিমা। 'আজকে তোরা পোপ দেখেছিস। সেই জন্যে কেক'। মুখে আশকারা ছুঁয়ে থাকা বিশ্বমায়ের হাসি। সবুজের বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। আমরা এগিয়েছি অনেকটা। এখন তাই রাস্তা দিয়ে পোপ গেলে দরকারে ভিআইপি রোড অবরোধ করে দিতে পারে কেউ। খুঁড়ে দিলেও আশ্চর্য হব না। বাঙুর থেকে লেকটাউন আলোর মালায় ঝলমল, লন্ডন থেকে পৌঁছে গেছে বড়ো ঘড়ি। কিন্তু সময় এগিয়েছে কি? রাম রহিম আর পোপের চক্করে এখন কোন মিছিলে হাঁটব সেটাই ঠিক করা মুশকিল। বাঙুরের অলিগলি দিয়ে সবুজদের রাজপ্রাসাদে যে খোলা হাওয়া আশির দশকে ঢুকত, প্রায় অর্ধশতক পেরিয়ে সে এখন ফ্ল্যাটবাড়ির বন্ধ দরজার সামনে ধুঁকছে।

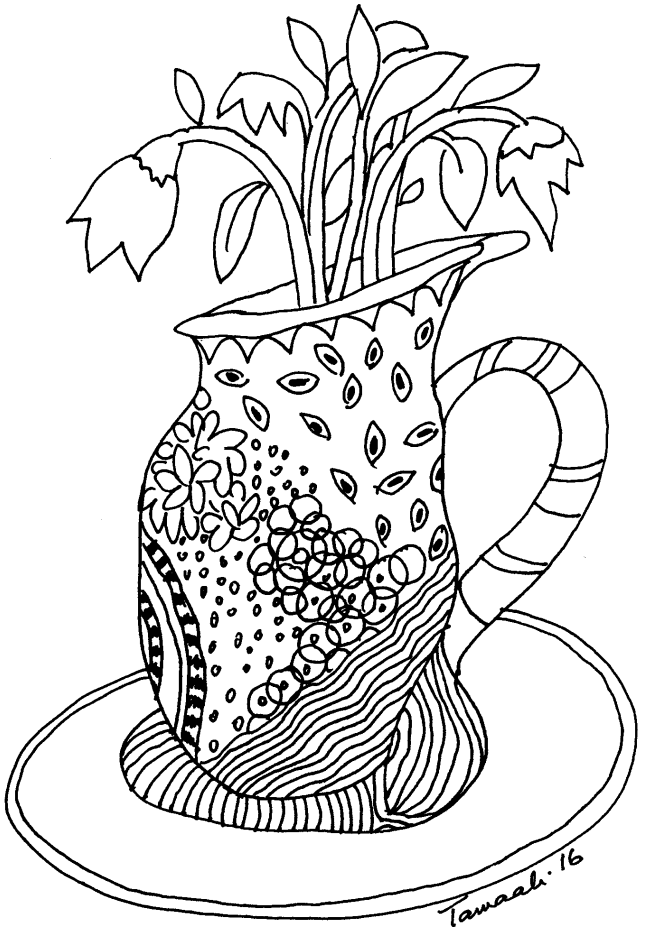

স্বপ্ন, সময়, ভালোবাসা

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

শীতের দুপুর দিবানিদ্রার পক্ষে প্রশস্ত নয় মোটে। কিন্তু শীত-দুপুরের কমলা রঙের স্বপ্ন? আহা, সে বড়োই মেদুর। আমার প্রিয় যত লেখককে কেন জানি না এই দুপুরেই স্বপ্নে দেখি বারবার। এবারের মতো বইমেলা পার্বণ শেষ করে সেদিন দুপুরে হঠাৎ দেখলাম নীল শার্ট পরা ভাস্কর চক্রবর্তীকে। কফি হাউসের সিঁড়ির নীচে স্বপনের দোকানে সিগারেট কিনে ঝোলানো দড়িতে জ্বালিয়ে নিচ্ছেন নিজের সময়। আমি ডাকতে চাইলাম: ভাস্করদা। তারপরই জেগে বসে ভাবলাম 'ভাস্করদা' বলে ডাকার তো কথাই নয়। এই কলকাতায় আমি ভাস্করের সহনাগরিক হিসেবে অন্তত দশ বছর কাটিয়েছি কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি কখনো। কিন্তু কীভাবে যেন ভাস্কর চক্রবর্তী আর তাঁর বন্ধু, 'বালক জানে না' কিংবা 'নীল অপেরা'র কবি সুব্রত চক্রবর্তীর কথা উঠলে আজকাল আমরা অবলীলায় ভাস্করদা কিংবা সুব্রতদাই বলি। হয়তো বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে প্রত্যক্ষত চিনি তাই। হয়তো কবি অরণি বসুর মুখে কিংবা লেখায় এঁদের কথা ক্রমাগত শুনি তাই। এই তো সেদিন প্রায় ভোরবেলা ফোন করে অরণি বসু শোনালেন তাঁর সদ্য-রচনা কবিতাখানি:

রবীন্দ্রসদন স্টেশনে নামতে যাব ধাক্কা খেলাম সুব্রতদার সঙ্গে—
সেই মোটা কালো ফ্রেম, মাথাটা পুরো সাদা।
পেছনে ভাস্করদা জিন্‌সের প্যান্ট, লাল টি-শার্ট।
শামসেরের বয়স বাড়েনি।
তর্কে ব্যস্ত ব্যান্ডমাস্টার আর মানিক চক্রবর্তী,
মানিকদাকে এই প্রথম দেখলাম পাজামা-পাঞ্জাবিতে
মাথায় আবার গামছার পাগড়ি।

আমার আর নামা হল না
ষাটের তোড়ে সেঁধিয়ে গেলাম কামরার ভিতরে।
চললে কোথায়? সমস্বরে ষাট উত্তর দিল, মোচ্ছব করতে।
সুব্রতদা বলল, কেমন আছিস? মাসিমা-মেসোমশাইয়ের সঙ্গে
মাঝে মাঝে দেখা হয়।
ভাস্করদা, উলুখড়-এর কবিতা সংখ্যায় আমার লেখা নেবে না?
আমি এখন নীল আকাশে মেঘের কালি দিয়ে লিখি।
সুব্রতদা, আকাশ যে নীল নয় এখন বালকও জানে, ভাস্কর জানে না।
সবাই হো হো করে হেসে উঠল।
শামসেরের মুখে কোনো কথা নেই, চশমার পেছনের চোখে সেই
অসাধারণ হাসি।
তর্ক থেমে গেছে, তুষারদা এখন নতুন ছবির শট বোঝাচ্ছে
নিরুপায় মানিকদাকে।

আমি তো হাওয়ায় ভাসছি। এতদিন পর একগুচ্ছ ষাট।
সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে বুদ্ধদেবের খবর কী?
বললাম, এই মুহূর্তে আর. এন. টেগোরের কেবিনে শুয়ে খুব
শক্ত একটা অঙ্ক কষছে।
কফিন কিংবা সুটকেশ ছেড়ে হিমযুগ পার হয়ে এখন বলছে,
বেঁচে থাকা জিন্দাবাদ।
(বালাই ষাট ও সত্তরের একজন/'খেলা চলে')

কিন্তু এই আত্মীয়তার-প্রায় নৈকট্য ভাস্কর ছাড়া অন্য কবিদের ক্ষেত্রে আমার অন্তত হয়নি। শামসের আনোয়ারের ক্ষেত্রেও না। সুব্রত চক্রবর্তী পড়েছি এই সেদিন। আর আমাদের যতদিন ছাত্রদশা চলেছে তখন ভাস্কর সম্ভবত খুব বেশি পঠিত হতেন না। ভাস্করের কবিতা নিয়ে ইদানীং তরুণ কবিতা পাঠকের যে উচ্ছ্বাস তা বেশ সাম্প্রতিক। তুষার রায় চিরকালই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। যদিও তার অনেকটাই তাঁর জীবনযাপনকেন্দ্রিক মিথের কারণে। মানিক চক্রবর্তী কি কেউ পড়েন আর? আমরা ভাস্কর পড়েছি ২০০৫-এ তাঁর মৃত্যুর পরই। তার আগে 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'র কিছু লাইন জানতাম না তা নয়, কিন্তু তা ঠিক ভাস্করকে জানা নয়। আবার এই অপরিচয়ের কারণে ভাস্কর অনেকটাই আমার নিজস্ব প্রতিমা। তাঁর লেখাপত্রে বা অন্যের স্মৃতিবাহিত হয়ে যেভাবে এসেছেন আমার কাছে।

ভাস্কর চক্রবর্তী কতবড়ো কবি বা বাংলা কবিতার ধারায় ভাস্করের অবস্থান কতটা স্বতন্ত্র এই নিয়ে বিদ্যায়তনিক বাহাস খুব কম হয়েছে বলে মনে হয় না। তাই আপাতত সেইসব আলোচনা সরিয়ে রেখে আমরা মনোনিবেশ করতে পারি কিছু অন্য বিষয়ে।

সমসময়েই ভাস্কর কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যদিও প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পুরস্কার তাঁর জোটেনি। তবে বাংলা কবিতার একজন প্রধান লেখক হিসেবে প্রথম থেকেই তিনি পাকাপোক্ত জায়গায় আসীন। যেমন ধরা যাক, তাঁর বন্ধু শামসের আনোয়ারের কথা। ১৯৯৬-এ প্রকাশিত হয় শামসের আনোয়ারের একটি বই 'শক্তি ও তাঁর পরবর্তী কবিরা', যেখানে শক্তির পরের কবি হিসেবে আলোচনা এগিয়েছে ভাস্কর চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, দেবারতি মিত্র এবং জয় গোস্বামীর কবিতা ঘিরে। সেখানে কিন্তু শামসের বন্ধুর প্রতি কয়েকটা জায়গায় রীতিমতো খড়্গহস্ত। এমনকী ভাস্করের চতুর্থ বই 'দেবতার সঙ্গে'-কে তাঁর মনে হয়েছে 'একটি সম্পূর্ণ অনাধুনিক এবং ব্যর্থ বই'। আবার পাঁচ-নম্বর বই 'আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে' তাঁর 'সম্পূর্ণ অপাঠ্য মনে হয়েছে'। তবু শামসের মনে করতেন বাংলা কবিতায় 'শক্তির পরবর্তী কবিদের মধ্যে ভাস্কর চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে একটি দীপান্বিত নাম'।

ভাস্করের সমসময় নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মণীন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন: 'দলবদ্ধ হবার জন্য পূর্ববর্তী দশকগুলোর মতো ষাট কোনো অনুকূল পরিস্থিতি তো পায়ইনি, বরং ছিল আরও কিছু সূক্ষ্ম প্রতিকূলতা।' এখানে 'সূক্ষ্ম' কথাটার দিকে সহজেই মনোযোগ আকর্ষিত হয়। তীক্ষ্ণধী লেখক মণীন্দ্র গুপ্তের এই মন্তব্যে বাংলা কবিতার বিভিন্ন শিবির ও তার টানাপোড়েন আদৌ উল্লিখিত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু ভাস্করের সময়টা একজন নতুন কবির পক্ষে আদৌ সহজ ছিল না। তাঁর প্রথম বই 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭১-এ। তার আগের কয়েক বছরে বেরিয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', শঙ্খ ঘোষের 'নিহিত পাতালছায়ায়', অলোক সরকারের 'বিশুদ্ধ অরণ্য', অলোকরঞ্জনের 'নিষিদ্ধ কোজাগরী', সুনীলের 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ছেলে গেছে বনে' প্রকাশিত হবে পরের বছর। শঙ্খ ঘোষের 'আদিম লতাগুল্মময়' আর শক্তির 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই'— সেও ১৯৭২-এ। আর ৭১-এই প্রকাশিত হয়েছিল নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'উলঙ্গ রাজা', আল মাহমুদের কবিতার মিনিবুক। বাংলা কবিতার গঙ্গা-পদ্মায় ভরা বর্ষার বেগ। তখনই ভাস্কর অবতীর্ণ হলেন খুব জোরালো ও আত্মমুখী কবিতা নিয়ে। মধ্যবিত্তের গ্লানি, নেতিয়ে পড়া জীবন, পরিবার ও তার খুঁটিনাটি, অসুখ, অসুখ, মনখারাপ, কলকাতার রাত্রিদিন, বিরস বিকেল সংকেতে আর অব্যর্থ শব্দের প্রয়োগে গড়া চিত্রকল্পে উঠে আসতে থাকল তাঁর কবিতায়।

প্রথম কবিতার বই 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'য় ভাস্কর 'শুধুমাত্র তোমাকে/২' কবিতায় লিখছেন—

তোমার হাসি
ভালো লাগে আমার— পথের
মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে
তুমি যখন হেসে ওঠো হঠাৎ— পুলিশও
মুখ ফিরিয়ে দেখে নেয় আমাদের
সিগারেট ধরায়

কিংবা, ওই বইয়েরই 'তোমাদের/২' কবিতায় লিখছেন—

কেরোসিনের গন্ধে, আবার মনে পড়ল তোমাদের—
অন্ধকার উঠোন—
কোথায়, ট্রেন চলে যাচ্ছে দূরে
আর এই সন্ধেবেলা, আমি একা একা বসে আছি
চেয়ে দেখছি, আমার জানালা, আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে
দু'দিকে
তোমাদের কাপড়-কাচা শেষ হয়েছে এখন?
অনেক বছরের পর, আরও অনেক বছর, কীরকম পার হয়ে
গেলো
মনে পড়েছে আজ তোমাদের সাদা বিড়াল-ছানাটার
কথা— মনে পড়ছে
তোমাদের হাসি— চোখের জল তোমাদের

এই অব্দি পড়ে জানি না কেন আমার আন্দ্রেই তারকোভস্কির 'মিরর' ছবির কথা মনে পড়ে যায়। আদিগন্ত ঘাস জমির বুকে তখন পুলক জেগেছে, বিপুল ঘাসের গায়ে ঢেউ, বাঁশের বেড়ার উপর বসে মার্গরিটা তেরেখোভা।

অথবা, ভাস্করের বিখ্যাত কবিতা 'ছোটো বোন' (শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা)—

আমি কি পাহারা দেবো
ছোটো বোন ঘুমায় যখন

দুপুরে, আকাশ নীল
শরীরের, শান্ত কলরব

আমি কি ঘুমোবো পাশে
ছোটো বোন ঘুমায় যখন

এই কবিতা তিরিশের দশক থেকে বাংলা কবিতার যে সংস্কার ও পরম্পরা গড়ে উঠেছে তার থেকে অনেক দূরবর্তী। কমিউনিস্ট সুভাষ, ফ্ল্যামবয়েন্ট সুনীল, প্রবল শক্তি, ভিন্ন রুচির অধিকারী শঙ্খ ঘোষের থেকে অনেকটাই দূরে। প্যান্টের ভিতরে

না-গুঁজে পরা নীল শার্টের এই কলকাত্তাই যুবক তাই স্তম্ভিত করে দিলেন হাইবারনেশনের কথা তুলে। অমরত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁর এক পূর্বজ কবি কিন্তু সে-প্রত্যাখ্যান বড়োই নাটকীয়, পেলব। আর ভাস্কর বলে দিলেন স্বর্গ-টর্গ কিচ্ছু কোথাও নেই, আছে শুধু মাথাধরার ট্যাবলেট। ব্যস এক সারিডন!

এত অসুখ, এই ক্লান্তিকর সুনাগরিকতা, নিউরোটিক বাস্তবতা সত্ত্বেও ভাস্কর কিন্তু জীবন বিমুখ নন। মৃত্যু পরোয়ানাকে অতিথি ভাবেন তিনি। ভয় নেই তাকে। উদ্দেশ্যহীন দুশ্চিন্তানগরীতেও তিনি আমাদের কাঁধের পাশে সুষমাময়ী চন্দ্রমা স্থাপন করেন, যেন একটা ফটোগ্রাফে অলীক কৌশলে জুড়ে দেন ডানা। চোখে ভাসে পৃথিবীরই স্বপ্ন। টুকে নেন মানুষ জীবনের দু-তিনটে পঙ্‌ক্তি। অকারণ চলে যাওয়া নয়, থেকে যাওয়ার আকুতি তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে—

এ এক যন্ত্রণা দিনরাত, তবু
শান্ত হয়ে ভিড়ে মিশে থাকি।

ধোঁয়া ওঠে সন্ধেবেলা
আজো ভেসে ওঠে সেই মুখ।

রাতগাড়ি চলে যায়
ভাঙাচোরা জীবনকে কিছুটা ঝাঁকিয়ে।

পাতাল, অনন্তকাল ঝুঁকে আছি—
ভালো, তবু
ভালো এই মানুষজীবন। (মানুষজীবন/আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে)

আবার 'হারে রে রে' (শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা) সিরিজের ৮ নম্বর কবিতায় লিখছেন:

লাল পিঁপড়ের লাইন ধরে, ঘুরে বেড়ালাম, সমস্ত সকালবেলা—
ছুটতে ছুটতে দেখে এলাম
দু'একটা দাড়ি পাকছে সন্দীপন চাটুজ্যের— এবং
সমস্ত কিছু ঠিকঠাক আছে, সমস্ত কিছু,
শুধু ও-পাড়ার ছেলেরা

রাতদিন মাইক বাজাচ্ছে
হস্টেলের বারান্দা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েরা ঝুঁকে পড়েছে, আমার
সর্দি হলো খুব—
তবু হেই হেই করে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে
আমি খড়ম হাতে ছুটে গেলাম রান্নাঘরে—
ঝুলভর্তি রান্নাঘর থেকে ডাক পড়ল আমার, আহা, বিছে মারার জন্যে

আমার ধারণা বাংলা কবিতা এমন আরবান স্মার্টনেস শেষ দেখেছিল সেই বহু আগে, অন্য প্রেক্ষিতে, সমর সেনে। সন্দীপনের কথা উঠল যখন, জানি না কী গুণ বরানগরের মাটিতে, সন্দীপনও এক ধরনের স্মার্টনেসের চর্চা করছেন। সফল হয়েছেন, আবার ক্রমাগত ব্যবহারে প্লাস্টিক স্মার্টনেসের আমদানি করেছেন কোথাও। যেন এই সপ্রতিভতা উচ্চকিত কিছুটা। ভাস্করে যা আবার শব্দ-নৈঃশব্দ্যের নিখুঁত জ্যামিতি। বিবৃতি হলেও তা একা মানুষের ডায়েরির পাতা। কোনো উদ্দিষ্ট নেই, নেই কোনো নাটকীয়তা, শুধু নিদ্রা আর জাগরণের মৌল অনুভবগুলি টুকে রাখা। মনে রাখতে চাই এই সপ্রতিভ যুবক ভাস্কর কবিতা লিখতে লিখতে ক্রমশ এগিয়ে যাবেন 'জিরাফের ভাষা'র দিকে। ১৮ ফুটের যে প্রাণীটি বিশাল গলা উঁচিয়ে টপ অ্যাঙ্গেলে দেখে চলে আমাদের, আর ইনফ্রাসোনিক কম্যুনিকেশনে বিশ্বাস করে, যা মানুষের কানে ধরা দেয় না। এই নিবিড় নীরবতার সাধনা ভাস্করকে অনন্য করেছে। এবং আমাদের ধারণা ভাস্করের এই নিভৃত-নীরব পথচারণা অনিবার্য ছিল।

দুই

ভাস্করের কবিতার সঙ্গে প্রাথমিক মোলাকাতে আমি একটা বড়ো সংকটে পড়েছিলাম তাঁর কবিতায় বাহ্যিকভাবে সেই সময়কে তেমনভাবে খুঁজে না পেয়ে। ষাটের দশকে বড়ো হওয়া কবি, যিনি চোখের সামনে দেখেছেন বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তাল রাজনৈতিক সময়, কোথায় সেই সমসময়ের চিত্রণ? এই কবি কি প্রতিক্রিয়াশীল? পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা? আমার ব্যক্তিগত সংকট যদি স্পষ্ট না হয়, তা হলে খোলসা করে বলি আমি এমন সংকটে প্রায়ই পড়ি। যেমন ধরা যাক ন্যূনতম আস্তিক্যবোধ না থাকলেও কেন আমার রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান ভালো লাগে? অবশ্য এর উত্তর আবু সয়ীদ আইয়ুব সুচারুভাবে দিয়েছেন 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথে'। তেমনি ভাস্করে কেন নেই খাদ্য আন্দোলন, কেন নেই যুক্তফ্রন্টের উন্মাদনা, প্রথমবার অকংগ্রেসি সরকার গড়ার জন্য বাঙালির একাংশে তীব্র উত্তেজনা, কেন নেই নকশালবাড়ি? অথচ ভাস্করের বাড়ি খোদ বরানগরে। যে-বরানগরে সেদিন চুল্লির প্রহর। যেখানে আজও গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, রাস্তার বাঁকে, দোকানের আড়ালে ছোটো-বড়ো শহিদ বেদি। কংগ্রেস-নকশাল-সিপিএমের ত্র্যহস্পর্শে আক্ষরিক অর্থেই যুদ্ধভূমি। যদুবংশের মহাভারতীয় পরিণতির উপমাতেই শুধু বর্ণনা করা যায় বাংলাকে তখন।

কিন্তু এ দেখা ভাস্করকে নেহাতই ওপর ওপর দেখা। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো গ্যালপিং ট্রেনকে চলে যেতে দেখা। ভাস্করের লেখায় রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে আসেনি ঠিকই কিন্তু একথাও ভোলা চলে না যে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা মানে চয়েস অফ পজিশন। ভাস্কর তাঁর সমসময়কে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাননি। তাঁর প্রকাশের ভাষাটি স্বতন্ত্র। রাজনীতি যে বৃহত্তর চালচিত্রের কথা বলে তার আওতা থেকে বেরোবেনই বা কী করে? তবে তিনি নিজেকে ভাবতেন কবিতাবাদী। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু সেই ভয়াবহ সময় এসেছে তাঁর কবিতাতেও। 'আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে' বইয়ের 'দশ বছর আগের একদিন' কবিতাটি এইরকম:

চোখগুলো দেখেছিলো
একদিন এ-পাড়া ও-পাড়া।

রক্ত রক্ত রক্ত রক্ত শুধু।

এখন সমস্ত শান্ত, তবু
দু-একটা কাটা মুন্ডু নড়েচড়ে ওঠে।

এমনকী 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'-তেও কবর, দুঃসময়, পাড় ভাঙার শব্দ কবিতার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে।

মনে হয় তাঁর কবিতায় রাজনীতি নিয়ে একদিন যে প্রশ্ন উঠবে একথা ভাস্কর জানতেন। তাই 'নিজস্ব মাদল' গদ্যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লিখছেন: 'সব থেকে বেশিরকমের স্বাধীনতা আমি কবিতার কাছ থেকেই নিয়েছি। লক্ষ রেখেছিলাম, ফাঁকা আশাবাদ যেন আমার কবিতায় কখনোই না ঢুকে পড়ে। স্বীকার করা উচিত যে, আমি কোনোদিন রাজনৈতিক কবিতা লিখিনি। তবু, কেউ যদি হঠাৎ এসে, আমার কোনো কোনো কবিতার দিকে আঙুল তুলে বলেন যে, 'ওই তো রাজনীতি, ওই তো রাজনৈতিক কবিতা'— আমি হয়তো সে-সময়, তেমন একটা বিস্মিত হবো না।'

একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর কাছে গত দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী জানতে চাইলে তিনি কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন 'গত দশক মানে সত্তর দশকের কথা। নকশাল আন্দোলন। যা বুর্জোয়া নার্ভ সিস্টেমকে কিছু সময় কোলাপস্ করে দিয়েছিল'। আবার ওই সাক্ষাৎকারেই যখন তাঁর কবিতায় পারিপার্শ্বিকতা এড়িয়ে যাবার অভিযোগ উঠেছে, ভাস্কর সপাটে জবাব দিয়েছেন: 'না আমি এড়িয়ে যাইনি। বরং সেগুলোকেই আমি বেশি করে টেনে নিয়েছি। আমি ঠিক ততটা সাহসী নই। তবে একজন যথার্থ শিল্পীর সামনে যদি কোনো অন্যায় ঘটে তবে কোনোদিনই তিনি ভুলে যেতে পারেন না। ভেতরে ভেতরে এটা কাজ করেই যায়। বার্নার্ড শয়ের একটা উক্তিই মনে পড়ছে— Judge not the play before the play is done'।

ভাস্করের একখানি আশ্চর্য গদ্যবই 'শয়নযান'-এ এক জায়গায় দেখি ভাস্করের সঙ্গে বাজারে হঠাৎ করে সুমন্তের দেখা হয়ে যায়। সুমন্ত বলে: 'একসময় আমি ভেবেছিলাম, সুবিচারের আশায় দরজা-বন্ধ করে বসে না থেকে জেলে বসে মরা অনেক ভালো। ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল মানুষজন। আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে এক বছর আমার গলা থেকে স্বর প্রায় বেরত না। তাই বলে, আমার লাউ থেকে চিংড়ি সরে গেছে বলে ব্যক্তিগতভাবে আজ আমার আর দুঃখ নেই কোনো'।

এই সুমন্তের কথার উত্তরে কবি বলছেন: 'সুমন্ত, এটা তো তোমার বোঝা উচিত, ওই গণহত্যার সমর্থনকারী আমি নই। কোনো ব্যক্তিহত্যারও সমর্থনকারী নই আমি। তুমি যা বলছ, সেটা একটা, অতিনাটকীয় ব্যাপার। আর এই অতিনাটকীয়তাকে আমি জীবনে জায়গা দিতে চাইনি কোনোদিন। লেখা ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারি না।'

আমাদের ধারণা রক্তপাতের রাজনীতি তাঁর অন্তর্জগতে এক ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সক্রিয় রাজনীতির বিরুদ্ধে। একে আমরা এক অর্থে রিজেকশনের রাজনীতি হিসেবেও ভাবতে পারি। হয়তো একজিস্টেনশিয়াল দর্শনেও এর কিছুটা ব্যাখ্যা মিলতে পারে।

আবার নকশালবাড়ির আন্দোলন শেষ হবার পঞ্চাশ বছর পরে ভাস্করকে বেশ প্রজ্ঞাবান বলেও মনে হয়। কেননা আমরা তো জানি সশস্ত্র পথের সে-রাজনীতি আজ কোথায় পড়ে আছে। বাঙালি ওপথে এগোতে চায়নি আর। রাজনীতির ভাষা ও মুদ্রা স্বাভাবিক কারণেই গেছে পালটে। কিন্তু ভাস্করের কবিতা জেগে আছে অন্ধকারের মধ্যে ছোট্ট একটা চিরাগের মতো। চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না। কিন্তু পথিকের স্বস্তি। তাই বোধহয় কুড়ি-একুশের ছেলেমেয়েরা এখন পড়তে ভালোবাসছেন ভাস্করকে। ভাস্কর প্রজন্মবাহিত হয়েছেন। আর আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি বরানগরের গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, ভাস্করের 'কারুবাসনা' বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে এ যেন কত দিনের চেনা পাড়া।

পাখি দেখা, পাখি চেনা

সুভাষ ভট্টাচার্য

সুদীর্ঘকাল শব্দবিদ্যার জালে আটক থাকার ফলে আমার অন্য দু-একটা ভালোবাসার বিষয় প্রায় ছেড়েই যাচ্ছে আমাকে। এমনই এক সময়ে পাখির বিষয়ে কিছু লেখার আহ্বান এল, আর আমিও কালক্ষেপ না-করে সাগ্রহে সম্মত হলাম। কিন্তু আরো এগোবার আগে একটুখানি ভূমিকা করে নেওয়া একান্তই দরকার। আমার দিক থেকে তা একটা কৈফিয়তই হবে।

বারো-চোদ্দো বছর বয়েস পর্যন্ত প্রথাগত লেখাপড়ার বাইরের কিছু প্রথাবহির্ভূত বিষয়ের প্রতিই আমার আকর্ষণ ছিল বেশি। এতটাই যে, লেখাপড়া করে মূলস্রোতে ফিরব, এমন বিশ্বাস আমার অভিভাবকদের ছিল না। আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের দুর্ভাবনার শেষ ছিল না। আমার জীবনের সেই পর্বে যেসব নেশা পেয়ে বসেছিল আমাকে, তারই একটা হল পাখি। পাখি আমাকে প্রায় পুরোপুরি অধিকার করে ফেলেছিল। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা বার্ড-ওয়াচিং-এর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

শুরুটা হয়েছিল নিতান্তই অনাড়ম্বরভাবে। পাখি দেখায় আমার গুরু কেউ ছিলেন না। তবে সঙ্গী অবশ্যই ছিল। স্কুলের বড়ো ছুটিতে বরিশালের গ্রামের বাড়িতে যখন যেতাম, তখন আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হত সমান বয়সি রফিক। তারই সঙ্গে স্টিমার দেখতে চার মাইল দূরে খাল বেয়ে যাওয়া, চলত গাছপালা চেনা। আর অবশ্যই পাখি দেখা। সেই আমার পাখি চেনার শুরু, ক্রমে রফিক নেশাই ধরিয়ে দিয়েছিল। রফিক বহু পাখি চিনত, বহু পাখির ডাক শুনে অভ্রান্তভাবে শনাক্ত করত সেই পাখিকে। মনে আছে সে-ই আমাকে প্রথম হুপো দেখিয়েছিল। যাকে আজ হুপো (Hoopoe) বলি রফিক তাকে বলেছিল 'মোহনচূড়া'। অনেক পরে জেনেছি পশ্চিমবঙ্গের হুপোকে বাংলাদেশে 'মোহনচূড়া' বলা হয়। আরো জেনেছি, 'মোহনচূড়া' নামটা বনফুলের দেওয়া। আমার পাখি দেখার গুরু যদি কাউকে বলতেই হয়, সে হল রফিক। স্বাধীনতার মাস দু-তিন আগে আমরা কলকাতায় আমাদের খিদিরপুরে বাড়িতে চলে আসি। রফিকের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। খোঁজ পাইনি তার। আমার জীবন থেকে হারিয়েই গেছে সে।

দুই

পাখি দেখা এখন আগের মতন নিছক খেয়াল খুশির ব্যাপার নেই আর। এখন এটা একরকম বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইদানীং পাখি দেখাকে এক ধরনের Citizen Science বলা হচ্ছে। কথাটা নতুন উদ্ভাবন। আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে সাধারণ পাখিপ্রেমিকেরা পাখি দেখতে বেরোতেন বড়োজোর গলায় একটা মাঝারি পাল্লার বাইনোকিউলার ঝুলিয়ে। মাঠে-জঙ্গলে-পাহাড়ে চেনা-অচেনা পাখি দেখার পাখি চেনার, আর ঘন পাতার আড়াল থেকে ডাক শুনে শনাক্ত করার আনন্দ কম ছিল না। আমরা অনেকেই এভাবেই পাখি দেখে বেড়াতাম। এখন অন্য সবকিছুর মতো পাখি দেখাতেও পেশাদারিত্বের ছোঁয়া লেগেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভালোমতনই জুড়ে যাচ্ছে এইসবের সঙ্গেও। আমার ক্ষেত্রে বন্ধু ও পরিজনেরা বলতেন 'পাখি দেখার বাতিক।' এখন বাতিকও আর নিছক বাতিক থাকছে না। এখন বহু bird watchers' club হয়েছে, দলবদ্ধভাবে পাখি দেখার চল হয়েছে। ক্যামেরা বা মাঝারি পাল্লার বাইনোকিউলার এখন যথেষ্ট নয় আর। টেলিস্কোপ বা টেলিস্কোপিক লেন্সওয়ালা ক্যামেরাই দস্তুর এখন। এমনকী, একধরনের webcam-ও ব্যবহার করা হচ্ছে।

এতে অবশ্যই নানান প্রজাতির পাখির ফোটো তোলার সুবিধে হচ্ছে। এমন সব ছবি দেখতে পাই যাতে কোনো পাখির ছবি দেখে মনে হবে দশ হাত দূর থেকে তোলা। আসলে হয়তো সে পাখি একশো ফুট কি দুশো ফুট দূরে কোনো গাছের ডালের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে ভাবছিল, তার গোপনতা আক্রান্ত হয়নি। হয়েছে যে, তা সে জানতেও পারেনি।

তিন

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পুরুলিয়ার মুরাডিতে যেতাম আমি।

আসানসোল আদ্রা রেলসড়কের মাঝের একটা স্টেশন মুরাডি। মাইল দুয়েকের মধ্যেই জঙ্গল, পাহাড়। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়, কিন্তু দুর্ভেদ্য নয়, দুরারোহ নয়। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আধ ঘণ্টা হাঁটলেই নানান প্রজাতির পাখির দেখা পাওয়া যেত। আমার যে ক্যামেরাটি ছিল তার লেন্স সাধারণ শক্তির। বড়োজোর ত্রিশ ফুট দূরের পাখিকে ধরা যেত। বাইনোকিউলার ছিলই না। তবু আমার মতো দুর্মর পাখিপ্রেমিককে হতাশ হতে হয়নি। বাংলা-বিহারের সীমান্তের কাছাকাছি জায়গাগুলোয় এমন পাখি দেখেছি, দক্ষিণবঙ্গের এই পুব দিকে যাদের দেখা সচরাচর পাওয়া যায় না। হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ পরগনা, নদিয়ার আধা শহরাঞ্চলে লোকালয়ের মধ্যেই কাক-পায়রা-শালিক-চড়াই ছাড়াও যেসব পাখির দেখা প্রায়ই মেলে সেগুলো হল বসন্তবউরি (barbet), বেনেবউ (black-headed oriole), হাঁড়িচাঁচা (Indian Treepie), কুবো (Crow Pheasant), বুলবুলি, সিপাই বুলবুল (red-whiskered Bulbul), টুনটুনি (tailor bird) ইত্যাদি। এসব পাখির দেখা কিন্তু পুরুলিয়ার ওই শুকনো পাহাড়ি অঞ্চলেও পাওয়া যায়।

চার

এইসব পখি আমাদের প্রতিবেশী। বহু বহু বছর ধরে এরা গ্রাম-শহর সর্বত্র মানুষের কাছাকাছি থাকে। লোকালয়ই এদের পছন্দ। তবে শহরের বৃক্ষবিরল জায়গায় স্বভাবতই এদের দেখা যায় না। গাছই এসব পাখির আশ্রয়। এর সব পাসেরিফর্মিস বর্গের পাখি, পায়ের আঙুল আর নখ দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে এরা। যেখানে গছপালা যত বেশি, সেখানে নানাপ্রজাতির পাখির আনাগোনাও তত বেশি (জলচর পাখির কথা আলাদা)।

একটা কথা ভেবে আক্ষেপ হয়। অধিকাংশ শহরের মানুষ হাতে-গোনা দু-পাঁচটার বেশি পাখি চেনেন না। পাখি সম্বন্ধে এঁদের কৌতূহলেরই একান্ত অভাব। অথচ গ্রামের মানুষ পাখি ভালোই চেনেন। আমি এমন অনেককেই জানি যাঁরা পুরুষ-চড়াই আর স্ত্রী-চড়াইকে আলাদাভাবে চেনেন না। অথচ পাখি সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল থাকারই তো কথা। পাখি সম্বন্ধে বহু চিত্তাকর্ষক আর বিস্ময়কর তথ্য জানা যায়! অধিকাংশ মানুষই তা জানেন না, জানার ইচ্ছেও নেই। আর সেই জন্য পাখিকে তাঁরা taken for grauted করে নেন। ভাবুন তো, গোল্ডেন প্লাভার কোথাও না থেমে এক হাজার মাইল উড়ে যেতে পারে, হামিং বার্ড প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চান্ন বার ডানা ঝাপটায়। যাদের আমরা পরিযায়ী পাখি বলি, সেইসব মরশুমি অতিথিরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে নির্দিষ্ট সময়ে উড়ে আসে আমাদের দেশে, আর সময় ফুরোলে অভ্রান্ত নিশানায় পৌঁছে যায় তাদের জন্মস্থানে আবার। তারা সময় ভুল করে না, পথ ভোলে না, গন্তব্যস্থান ভোলে না। কীভাবে সম্ভব? এসব ভাবলেও তো পাখি সম্বন্ধে কৌতূহল জাগার কথা।

ডুমুর গাছে পেয়ারা গাছে দরজিপাখি টুনটুনি তিন-চারটে পাতা সেলাই করে কী আশ্চর্য কৌশলে বাসা বানায়! পুরুষ আর স্ত্রী-পায়রার পরস্পর প্রেম নিবেদন, অভিমান, প্রত্যাখ্যান কিংবা আত্মসমর্পণের পর্যায়গুলো কতজন দেখেছেন? আমাদের অতি চেনা শালিক মাটিতে খানিকক্ষণ বিচরণ করার পরে যখন ওড়ে তখন একটা 'পিড়িং' আওয়াজ করে। এটা তার flight-call. সব পাখির এমন অভ্যেস নেই। কতজন লক্ষ করেছেন এটা? পাখিরা এত কাছে আসে, এত কাছে থাকে। তবু আমরা তাদের নিয়ে ভাবিত হই না। পাখি দেখাকে যে পেশাদারি দক্ষতার পর্যায়ে নিয়ে যেতেই হবে, এমন কথা বলি না। তবে পাখি দেখে পাখি চিনতে পারার মধ্যে, পাখির ডাক শুনে শনাক্ত করার মধ্যে আছে নির্মল আনন্দ। বহু প্রজাতির পাখির স্ত্রী-পুরুষের পালকের রং আলাদা, তা দেখেই তাদের চেনা যায়। আবার কাক শালিক বুলবুলি পাখিদের স্ত্রী-পুরুষে 'দৃশ্যত' ভেদ নেই।

পাঁচ

এবার ফিরে যাই আগের প্রসঙ্গে আবার। ১৯৭৪-৭৫ সালে পুরুলিয়ার মুরাডি অঞ্চলে আমার যাতায়াত আর সীমিতকালের অবস্থানকে আমি সানন্দে পাখি দেখার কাজে লাগিয়েছিলাম। তখনই জেনেছি, ওই অঞ্চলের বেশ কয়েকটা পাখিকে বর্ধমান হাওড়া হুগলিতে দেখা যায় না সচরাচর। কলকাতার কথা দূর অস্ত।

সকালে রোদ চড়ার আগে আর বিকেলে অন্ধকার নামার আগের সময়টাই পাখি দেখার প্রকৃষ্ট সময়। আমার শ্বশুরমশাই ওখানে নেতাজি আই হসপিটালের ডাক্তার তখন। তাঁর কোয়ার্টার্স থেকে মিনিট কুড়ি হাঁটলেই পাহাড়ের কোলে পৌঁছোনো যায়। এমন দিনও গেছে যখন এক ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করেও একটা-দুটো দোয়েল আর কুবো পাখি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি। কিন্তু বার্ডওয়াচারের তো এত সহজে হতাশ হলে চলে না। প্রয়াস চালিয়ে যেতেই হবে। এমনই একদিন পিছন দিক থেকে একটা জোরালো মিষ্টি শিস শুনে পিছন ফিরে দেখি হাত পনেরো দূরে একটা নিচু গাছের ডালে বসে অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করছে ফুটখানেক লম্বা ল্যাজঝোলা কালচে রঙের পাখি। কী পাখি! কী পাখি! ভাবতে ভাবতেই সে উড়ে গিয়ে কিছুটা দূরের একটা গাছে বসল। তেমন উঁচুতে নয় অবশ্য। হঠাৎ মনে পড়ল সালিম আলি আর অজয় হোমের বইয়ে এর ছবি দেখেছি তো। আর সন্দেহ নেই— শামা. অনেকে বলে শ্যামা। আশ্চর্যের কথা, এই পাখির হিন্দি আর ইংরেজি নামও শামা, Shama.

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রাণভরে দেখলাম। এ আমার প্রথম শামা-দর্শন কিনা। তারপর আর একটু এগিয়ে সন্তর্পণে তার কাছে যাবার চেষ্টা করতেই পাখিটা উড়ে গেল আমার চোখের নাগালের বাইরে। শামার মিষ্টি গানের কথা পড়েছি বইয়ে। দুর্ভাগ্য আমার, তার গান শুনতে পেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্যেই কেবল। শামা বুলবুল গোত্রের পাখি, শরীরটা যত লম্বা, লেজও ততটাই। লেজের গোড়ার দিকে পিঠের নীচের দিকটায় একটা সাদা ছোপ আছে। তাই দিয়ে সহজেই চেনা যায় তাকে। যারা পাখি দেখে তাদের কাছে এ এক আনন্দজনক অভিজ্ঞতা। কেননা শামাকে যখন তখন দেখা যায় না।

পুরুলিয়ার জঙ্গল পাখি দেখার পক্ষে ভারী সুবিধেজনক। কেননা, লোকালয়ের বাইরে-দূরের পাখিরা সাধারণত বেশ লাজুক ভীরু আর নিভৃতচারী হয়। সেদিক থেকে ওই জায়গাটা ছিল একেবারে আদর্শ। কোনো কোনো দিন আমার বড়ো ছেলে আর ওর ছোটো মাসি আমার সঙ্গী হত। কিন্তু ধৈর্য পরীক্ষায় ওরা ডাহা ফেল। বহুক্ষণ ঘুরে একটা-কি দুটো পাখি দেখে আনন্দে দুহাত তুলে নেচে ওঠা ওদের ধাতে সয়নি। পরে বেশিরভাগ দিন একাই গিয়েছি আমি। ওই পাহাড়ি জঙ্গলে আমি যে প্রতিদিন বহু পাখি দেখতে পেয়েছি তা নয়। তবে দু-তিনটি প্রজাতির পাখি দেখে মন ভরে গিয়েছিল। হাতিবাগানে পাখিওয়ালার খাঁচায় প্রথম দেখেছিলাম দামা পাখিকে। তখন অবশ্য লোকটি বলেছিল ওর নাম 'কমলা বউ।' ভারী সুন্দর পাখি। তখনই শুনেছি, স্ত্রী-পাখির চেয়ে পুরুষটি বেশি রংবাহারি। আমি সেদিন স্ত্রী-দামাকেই দেখেছি। পাখিওয়ালার কাছে পুরুষ-দামা ছিল না। দামার ইংরেজি নাম orange-headed ground thrush. পুরুলিয়ার জঙ্গলে আমি পুরুষ-দামারই দেখা পেয়েছি। ভারী চমৎকার তার গায়ের রং— মাথা থেকে বুক-পিঠ পর্যন্ত উজ্জ্বল কমলা রং। ডানার রং স্টিল-ব্লু। ডানার ফাঁকে সাদা ছোপ।

পুরুলিয়ার ওই পাহাড়ি জঙ্গলে দেখা দামাটি মাটিতে লাফিয়ে লাফিয়ে শুকনো পাতা সরিয়ে পোকামাকড় খুঁজছিল। শুনেছি-পড়েছি উত্তরবঙ্গে দামা প্রচুর দেখা যায়। তবে বর্ধমানে বা হুগলিতে তাকে দেখিনি। পুরুষ-দামা ভারী সুন্দর আওয়াজ করে। স্ত্রী-পাখিও গান গায় বটে, তবে পুরুষ-দামার গান স্ত্রী দামার গানকে হেলায় হারায়। প্রজনন ঋতুতে অন্য অনেক পাখির মতো দামার গানও বেশি সুরেলা হয়। গ্রীষ্মের শুরু থেকে বর্ষার সূচনাকালই এদের প্রজনন ঋতু। আর শুধু গান কেন, প্রজনন-ঋতুতে অনেক পাখিরই পালকের রং উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। দামা-ই আমাদের দেশের একমাত্র থ্রাশ-পাখি নয়। অন্তত তিন-চারটি প্রজাতি আছে আরো। মনে পড়ে যায় ইংরেজ কবি টমাস হার্ডির 'দ্য ডার্কলিং থ্রাশ' কবিতার সেই দুর্বল বুড়ো থ্রাশের কথা— An aged thrush, frail, gaunt and small,/ In blast beruffled plume,/Had chosen thus to fling his soul/upon the glowing gloom'. আমি অবশ্য যাকে দেখেছি তার চেহারায় অমন ক্লিষ্ট জীর্ণ ভাব ছিল না। বরং দেখেছি একটা পূর্ণবয়স্ক সদাচঞ্চল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা পাখিকে।

ছয়

একসময় প্রত্যেক গ্রীষ্মে এপ্রিল-মে মাসে ইংল্যান্ডে যেতাম। সেখানে, নরফোকশায়ারে নরিচ শহরে এবং তার আশেপাশে পাখি দেখার মস্ত সুবিধে ছিল। ওদেশের ওইসব শহরে গাছগাছালির বিপুল সমারোহ। ফলে পাখি দেখার জন্য প্রচুর হাঁটাহাঁটি করতে হয় না। এমনকী, আমার ছেলের বাড়ির বাগানেই আসে নানান প্রজাতির পাখি। ঘরের জানলায় বসেই দশ হাতের মধ্যে পাখি দেখার চমৎকার সুযোগ। অবশ্য ওদেশের অনেক পাখিই অন্য গোত্রের, মেলে না আমাদের দেশের পাখির সঙ্গে। একেবারেই যে মেলে না তা নয়। তবে কোনো কোনো পাখিকে চেনার জন্যে আমাকে বারে বারে খুলতে হত একখানা বই— Field Guide to the Birds of Britain and Europe. বান্টিং, রেডস্টার্ট, ব্ল্যাকবার্ড আমি ওদেশে যত কাছ থেকে দেখেছি, তত আমাদের দেশে দেখিনি, সুযোগই হয়নি। দশ হাতের মধ্যে বান্টিংকে দেখেছি। বান্টিং নানান রকমের হয়। আমি দেখেছি প্রধানত ল্যাপল্যান্ড বান্টিং, হুবহু আমাদের পুরুষ চড়াইয়ের মতো, কেবল বান্টিং-এর গায়ের হালকা হলুদ ছোপটা চড়াইয়ের নেই। ওদেশে ব্ল্যাকবার্ড দেখা যায় যখন-তখন। আমি আমাদের দেশে ব্ল্যাকবার্ড দেখেছি একবার-দুবার মাত্র। অথচ ইংল্যান্ডে বাড়ির পিছনের বাগানে ব্ল্যাকবার্ডের নিত্য আনাগোনা।

রেডস্টার্ট— যার বাংলা-হিন্দি নাম লালগির্জা বা লালগির্দি পশ্চিমবঙ্গে যত্রতত্র দেখা যায় না। কোনো কোনো অঞ্চলে একে ফিরফিরা বলা হয় শুনেছি। চড়াইয়ের আকৃতির ছোটো কালো পাখি, কালো এর পিঠটা, বুক-পেট হালকা কমলা রঙের। এ হল আমাদের দেশের রেডস্টার্ট। বিলেতের রেডস্টার্ট অন্য রকম— মাথা-পিঠ কালচে ধূসর, বুক-পেট হালকা কমলা। স্ত্রী-পাখির গায়ের রং আরো হালকা।

২০১০-এর মে মাসে আমার ছেলের বন্ধু স্টিভ (Steve Hipkin) আগে থেকেই বলে রেখেছিল আমি গেলে আমাকে নিয়ে ওদেশের বৃহত্তম পাখিরালয়ে যাবে। সেটার নাম পেন্‌সথর্প বার্ড স্যাংচুয়ারি (Pensthorpebird Sanctuary)। আসলে ওটা পেনসথর্প ন্যাচারাল পার্কের অংশ। জায়গাটা নরিচ শহর থেকে বেশ দূরে। স্টিভের গাড়িতে যেতে সময় লাগল ঘণ্টা দেড়েক। ওখানে পৌঁছে চা খেয়ে নিয়ে বার্ডওয়াচিং

টাওয়ারে গেলাম। নামে টাওয়ার হলেও ওটা আসলে একটু উঁচু জায়গায় তৈরি একটা ঘর। আমরা পৌঁছোবার আগেই আরো লোকজন ওখানে চলে এসেছে। তিন-চারটে জায়গায় এইরকম বার্ডওয়াচিং পয়েন্ট রয়েছে। ওখানে ছিলাম দু-ঘন্টার মতো। দেখা হল কমন পিপিট, হলদে-বুক ওয়ার্বলার। তবে আমার পুরস্কার হল একটা কালো-মাথা বান্টিং আর অনেক রকমের টিট, যাকে আমাদের দেশে রামগাঙরা বলে। অন্ধকার নামার আগেই আমরা বেরিয়ে আসি। পেনসথর্প অভিযান খুবই ভালো লেগেছিল। ওই একবারই গেছি অবশ্য।

সাত

পাখিদের নিয়ে নানা কথাই বলা যায়— তাদের অভ্যেস, তাদের নানা সময়ে নানা ধরনের ডাক, দেশ-দেশান্তরে তাদের অভিযাত্রা, ভিন্ন ভিন্ন ওড়ার ধরন, নানাভাবে তাদের লেজের ব্যবহার, তার খাদ্যাভ্যাস আর সেইমতো ঠোঁটের গড়ন ইত্যাদি কতকিছু। পায়রা ময়ূর আর হুপোর মতো পাখিরা তাদের ডানা আর পালককে কীভাবে ছড়িয়ে অনুরাগ প্রকাশ করে সে-ও এক দেখবার জিনিস। পাখিদের কোর্টশিপ ভারী কৌতুককর ব্যাপার। কোনো পাখির স্ত্রী-পুরুষ সারা জীবনের জন্য পরস্পরের কাছে বাঁধা থাকে, কোনো পাখির প্রণয়পর্ব একটি ঋতুতেই শেষ হয়ে যায়, কোনো পাখির প্রেম একবারে সংগমেই পূর্ণতা পায়। এ এক বিচিত্র ব্যাপার। তবে সব ক্ষেত্রেই একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। কোর্টশিপে পুরুষই প্রথম এগিয়ে আসে।

বহু বছর আগে প্রথম যেদিন জানতে পারি, যে-হাঁড়িচাঁচা সারাবছর তীক্ষ্ণ কর্কশ 'চ্যাঁ-চ্যাঁ' ডাকে সবাইকে সচকিত করে, সে-ই আবার প্রজনন-ঋতুতে মিঠে 'কু-অক-রিং' ডাকে মন মাতায়, সেদিন ভারী আহ্লাদ হয়েছিল। যাঁরা সাদা-কালো ফটকা মাছরাঙার (pied Kingfisher) মাছ শিকারের কায়দা একবার দেখেছেন, তাঁদের ইচ্ছে হবে বারবার দেখতে। খোলা আকাশে জল থেকে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট উপরে খানিকক্ষণ এক জায়গায় স্থির হয়ে ভাসতে ভাসতে ডানা ঝাপটাতে থাকে। তারপর দ্রুত সোজা নীচে নেমে এসে বল্লমের মতো ঠোঁট দিয়ে মাছকে গেঁথে তুলে নিয়ে উড়ে গিয়ে কোনো গাছের ডালে বসে নিশ্চিন্তে আহারপর্ব সারে। কিংবা ধরা যাক, গ্রে-শ্রাইক পাখির কথা, যার হিন্দি নাম লাকৌরা, আর যাকে বাংলায় কসাইপাখি বলেই জানি আমরা। কসাইপাখি ইঁদুর ব্যাং গিরগিটি মেরে কাঁটাওয়ালা কোনো গাছের ডালের কাঁটায় গেঁথে রাখে। তারপর সময়মতো বা খিদে পেলে ঠুকরে ঠুকরে খায়। কিছুটা আবার রেখেও দেয় পরে খাওয়ার জন্য।

সব মিলিয়ে পাখির জন্য এক বিচিত্র জগৎ। আমাদের অতি চেনা পাখির জীবন আর জীবনচক্রও যে কী চমকপ্রদ তা জানি কতজন? অনেক পাখির বাসা বানানোও এক আশ্চর্য শিল্প। কাক-চড়াই-শালিকের মতো আমাদের নিত্যসাথি পাখির জীবনেও আছে অনেক রহস্য। বিশেষজ্ঞরা প্রতিনিয়ত সে সব অনুসন্ধান করে চলেছেন। বহু রহস্যের সমাধান এখনও অধরা। পাখির গান, পাখির শারীরস্থানের বৈচিত্র্য, পাখিদের পারিবারিক জীবন ও সন্তানপালন— এসব বিষয় পাখি প্রেমিকদের ক্রমাগত টানে। 'অতিসাধারণ' পাখিও পাখিপ্রেমিকের চোখে 'অসাধারণ' হয়ে ওঠে। নইলে সালিম আলি বাবুই-চড়াইয়ের মতো সাধারণ পাখিকে নিয়ে কি জীবনের একটা বড়ো অংশ কাটিয়ে দিতেন'! শুধু কি তাই? যাঁকে Birdman of India বলা হয়, তাঁর আত্মজীবনীটির নামও লক্ষণীয়— Fall of a Sparrow.

চিঠির বাক্সো

আপনার পত্রিকার অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় (১৬-২৯ ফেব্রুয়ারি) উপাসক কর্মকার বাংলায় বর্গীয়-জ এর নীচে ফুটকি চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। আমি সেই প্রশ্নের জবাবে একটি-দুটি কথা বলব। উপাসক কর্মকার একজন বিদ্যাপ্রিয় সদাসচেতন মানুষ। বহু বিষয়ে তাঁর কৌতূহলী চিঠি আমার নজরে এসেছে। তাঁর সঙ্গে টেলিফোনেও নিয়মিত কথালাপ হয় আমার।

যতদূর জানি বাংলায় বর্গীয়-জ এর নীচে বিন্দুচিহ্নের প্রবর্তন প্রথম করেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর রচনাবলির সঙ্গে যাঁদেরই পরিচয় আছে তাঁরাই এটা মনে করতে পারবেন। ইংরেজি j আর z এর উচ্চারণে বিস্তর তফাত। বহুকাল পর্যন্ত বাংলায় দুটিকেই 'জ' লেখা হয়েছে। কিন্তু বস্তুত j-র ধ্বনিচিহ্ন হল /dz /। বাংলায় জ বা জ্। আর z-এর ধ্বনিচিহ্ন /z /। বুদ্ধদেব এই দুটি ধ্বনিকে আলাদা করতে চেয়েছেন বলেই z-কে বাংলায় লেখেন জ়। একথা ঠিক যে, বহুদিন পর্যন্ত অন্যেরা বড়ো-একটা অনুসরণ করেননি বুদ্ধদেবের দৃষ্টান্ত। বছর দশ-পনেরো ধরে অবশ্য অনেকেই জ় ব্যবহার করছেন। বিশেষত বিদেশি নামের প্রতিবর্ণীকরণে জ় চিহ্নটি খুবই দরকারি। আমি নিজে বহুদিন ধরেই ব্যবহার করছি। কেউ কেউ হয়তো জানেন, আমার 'বিদেশি নামের উচ্চারণ' বইয়ে অজস্রবার এই ফুটকি-ওয়ালা জ় আমাকে ব্যবহার করতে হয়েছে। তাই উপাসককে জানাই, একটি 'মান্য দৈনিক' পত্রে যদি এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তা হলে তাকে অনুচিত না বলে বরং সাধুবাদ দেওয়া উচিত।

সবসময়েই এই চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে, একথা বলি না। কিন্তু ঠিক ঠিক উচ্চারণ নির্দেশ করতে হলে জ় অনেকসময়েই দরকার হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। আশা করি উপাসক বুঝবেন। Amazing শব্দটির সঠিক উচ্চারণ বাংলায় দেখাতে হলে কিন্তু জ় অপরিহার্য— অ্যমেইজ়িং। এই শব্দে জ লিখলে ভুল সংকেত যাবে।

উপাসকের মনে যে-প্রশ্ন জেগেছে, তা আরো কারো কারো মনে জেগে থাকবে। আশা হয়, আমার এই উত্তর তাঁদের সন্তুষ্ট করবে।

সুভাষ ভট্টাচার্য
কলকাতা

২

আরেক রকম আমার স্বল্প কয়েকটি ভালো-লাগার পত্রিকার একটি। সম্পাদকের আগ্রহাতিশয্যে পত্রিকায় যে আমার 'অপ্রকাশিত রাশিয়ার জার্নাল' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এতে আমি আনন্দিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশেষ করে গত কয়েক সংখ্যা ধরে লক্ষ করে আসছি ছাপাখানার অনবধানবশত আমার লেখায় বড়ো বেশি সংখ্যক মুদ্রণপ্রমাদ থেকে যাচ্ছে। ছোটোখাটো মুদ্রণপ্রমাদের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু এমন কতকগুলি ভুল চোখে পড়ছে যার ফলে বক্তব্য অনেক সময় দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থান্তরের আশঙ্কাও দেখা দিচ্ছে।

এ বছরের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাতে কিছু বিদেশি শব্দ ও নামের ভুল বানানের সব ত্রুটির উল্লেখ না-হয় না-ই করলাম, কিন্তু 'মের্কেল'-এর বদলে 'সের্কেল' বা 'ইহুদি'-র জায়গায় 'টহুদি' ছাপা অমার্জনীয়। আর উক্ত নিবন্ধের সর্বশেষ পঙ্‌ক্তিতে যে ছাপা হয়েছে '... বিশেষ প্রতিনিধির চোখের সামনে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন প্যাট্রিস লুমুম্বা। (ঘটনাচক্রে তিনি ছিলেন ভারতের নাগরিক রাজেশ্বর দয়াল)' রীতিমতো বিভ্রান্তিকর। মূলে ছিল 'বিশেষ প্রতিনিধির (ঘটনাচক্রে তিনি ছিলেন ভারতের নাগরিক

রাজেশ্বর দয়াল) চোখের সামনে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন প্যাট্রিস লুমুম্বা।'

চতুর্থ সংখ্যায় মুদ্রিত রচনাটির প্রথম শব্দেই 'মস্কো'-র জায়গায় ছাপা হয়েছে 'সন্ধে'। এর পর 'অবাধ'-এর জায়গায় 'অবধি', 'লক্ষণাক্রান্ত'-র জায়গায় 'লক্ষণক্রান্তি', 'উপপ্লব'-এর জায়গায় 'উপল্লব' তো আছেই; কিন্তু মারাত্মক ভুল হয়েছে ছাপানো এই পঙ্‌ক্তিটি: 'তাই রাশিয়ার শেষ জার নিকলাই রমানভ তৎকালীন নিকট আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও...' ইত্যাদি। 'তৎকালীন' শব্দটির পরে 'ইংলন্ডেশ্বরী মহারানি ভিক্টোরিয়া এবং জার্মানির কাইজারের...' মাঝখানের এই অংশটি ছাপার ভুলে বাদ চলে যাওয়ায় বাক্যটি কোনো অর্থই বহন করে না।

ছাপানোর সময় আরেকটু যত্ন ও সতর্কতার পরিচয় দিলে বাধিত হব।

চতুর্থ সংখ্যার 'চিঠির বাক্সো'-তে জনৈক পাঠক বাংলা বানান সম্পর্কে সংক্ষেপে ছোটো একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টিতে ছোটো বলে মনে হলেও তার অনুষঙ্গে বাংলা বানান ও উচ্চারণবিধি সম্পর্কে আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও উঠে আসে, যদিও সম্পাদকমশাই পাঠকের সেই বিশেষ প্রশ্নের একটি সংক্ষিপ্ত জবাবও দিয়েছেন। আমার এই পত্রের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আমি আরো কিছু যোগ করতে চাই। অবশ্য সে অধিকার আমার সামান্যই, যেহেতু আমি ভাষাবিদ নই— একজন পাঠক হিসেবে আরেকজন পাঠকের সঙ্গে ভাববিনিময়ে ইচ্ছুকমাত্র।

প্রথমেই বর্গীয় জ-এর নীচে ফুটকি প্রসঙ্গে আসি। ইংরেজি ভাষার বহু শব্দ তো আমরা বাংলায় নিয়েছি, অথচ ইংরেজি ভাষার 'Z' উচ্চারণের উপযুক্ত প্রতিবর্ণীকরণের সংস্থান বাংলা বর্ণমালায় নেই— ইংরেজি কেন, হিন্দি উর্দুর 'জরুর', 'হুজুর'-এর যে 'জ', বাংলার কোনো কোনো জায়গার আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণে যে 'জ', যার উচ্চারণ 'Z' উচ্চারণের সমতুল, তাও বোঝানোর উপযুক্ত বর্ণ বাংলা বর্ণমালায় নেই। বাংলা বর্ণমালার সাহায্যেও সেই উচ্চারণ বোঝানো যেত না বলেই রাজশেখর বসু মহাশয়কে 'Zানতি পার না' লিখতে হয়েছিল। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালার সাহায্যে বাংলায় জ-এর নীচে ফুটকির আমদানি। আরো বলার আছে। বাংলায় F-এর সঠিক উচ্চারণ নেই। 'ফুল' আর 'Fool'-এর 'ফ'-এর উচ্চারণ তো আর এক নয়। 'F' দন্ত্যোষ্ঠ্য বর্ণ কিন্তু 'ফ' ওষ্ঠ্যবর্ণ। অথচ 'ফ'-এর নীচে ফুটকি বসিয়ে সেই সমস্যারও দিব্যি সমাধান করা যায়। আবার খ-এর নীচে ফুটকি বসিয়ে Scottish 'loch' বা জার্মান 'ach'-এর 'ch' উচ্চারণও আনা সম্ভব। প্রসঙ্গত, বাংলার কোনো কোনো প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণে এই ধ্বনিগুলির প্রায় সব ক'টিই আছে— যেমন চট্টগ্রামের উপভাষায় 'খ়ালিফূজ়া' (কালীপূজা)— অথচ বাংলা বর্ণমালায় তার স্থান নেই।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় একবার (বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৬৬) একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন:

"'কবিতা'র এই সংখ্যা থেকে আমরা বানানে একটি প্রয়োজনীয় নূতনত্বের প্রবর্তন করলাম: ইংরেজি 'Z' ব্যঞ্জনের স্থলে 'জ়' ও ফরাসি 'j' বা রুশীয় Zh-এর স্থলে 'জ়' অক্ষর ব্যবহৃত করা হল, ভবিষ্যতেও তা-ই করা হবে।..."

এই 'জ়'-এর সাহায্যে 'pleasure'-এর 'S'-এরও বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ সম্ভব। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটি তো দূরের কথা, প্রথমটি পর্যন্ত গ্রহণে অনেকের কেমন যেন অস্বস্তি। দ্বিতীয়টি কেন যেন একেবারেই অবহেলিত।

অনেকের মনে হতে পারে এমন সব ফুটকি আর আঁকড়ি কণ্টকিত হলে বাংলা বর্ণমালা আরো জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ইউরোপের অনেক ভাষার বর্ণমালাতেই এগুলির সংস্থান আছে। ফরাসিতে আছে, চেখ্ ভাষাতে বেশ কিছু পরিমাণেই আছে, জার্মানেও যে একেবারে নেই তা নয়; নীচে কেন, ওপরেও ফুটকি আছে, এমনকী জোড়া ফুটকিও আছে; আঁকড়ি তো আছেই। তাতে কারো কোনো অসুবিধা হয় বলে শুনিনি। বাংলাতে কিছু মাত্রায় প্রচলিত হলে লাভ বই ক্ষতি নেই।

বাংলা বানান ও বর্ণমালা সংস্কারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা মনে রেখেও বলতে হয় তাঁর সেই সংস্কারের পর থেকে একশো বছরের মধ্যে সেই বানান, তার লিখন, এমনকী উচ্চারণ পদ্ধতিরও যে কত পরিবর্তন ও সংস্কার ঘটেছে সে খেয়াল কি আমাদের আছে?

আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত দীর্ঘ ঈ-কারের ব্যবহার বর্জন করেছি: 'বাড়ী', 'গাড়ী' অনেককাল হল ছেড়ে গেছি, 'সূর্যে'র 'য'-এর পর দ্বিত্বও; উচ্চারণ অনুযায়ী বানান পদ্ধতি সংশোধন করতে করতে ম+ট,

ন+ট-এর মতো যুক্তব্যঞ্জনও তৈরি করে নিয়েছি—তাই যেমন 'মিষ্টি' লিখতে পারি, তেমনি 'স্টেশন'ও লিখতে পারি। 'ম্ল', প্ল-এর মতো যুক্ত ব্যঞ্জনের সাদৃশ্যে ফ্ল-ও চালু আছে; শুধু 'ম্লেচ্ছ' আর 'প্লাবন' থাকলে 'ফ্লাস্ক' যাবে কোথায়? 'ভ্ল' যুক্তাক্ষর কখনো বাংলায় ছিল কি? অথচ ম্লেচ্ছ 'ভ্লাদিমির'-এর কল্যাণে কখন কোন এক ফাঁকে ঢুকে পড়ে দিব্যি ঠাঁই করে নিয়েছে। ক্ট (ক্+ট্) যুক্ত ব্যঞ্জন তো চালুই আছে (তা নাইলে তো 'অক্টোবর' না লিখে হস্ চিহ্ন দিয়ে 'অক্টোবর' লিখতে হয়) এখন দেখছি ফ (ফ্+ট্) যুক্ত ব্যঞ্জনও আছে। তাতে বরং লাভই হয়েছে, হস্‌চিহ্নের হয়রানি থেকে অনেকাংশে রেহাই পাওয়া গেছে। হস্‌চিহ্ন ব্যবহারে আমাদের এমনিতেই ভারি আলস্য। কিন্তু বিদেশি শব্দেও বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় শব্দের মাঝখানে প্রয়োজনীয় হস্‌চিহ্ন ব্যবহার না করলে উচ্চারণ বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে।

অরুণ সোম
কলকাতা

মুদ্রণপ্রমাদগুলির জন্য আমরা লেখক এবং পাঠকদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করি। দুইজন দিকপাল ভাষাচর্চাকারীর কাছ থেকে এই চিঠি-দুটি পেয়ে আমরা কৃতজ্ঞ।

—সম্পাদক

পুনঃপাঠ

ভারতের জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের ধারার গুরুত্ব

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

এখন থেকে ঠিক ৯০ বছর আগে পূর্ব ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর বিক্ষোভের ব্যাপক চেহারা দেখে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন ভারতের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ ধনিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় চটকল সমিতি (আই.জে.এম.এ.)। ১৮৯৫-এর গোড়ার দিকে চটকল ও সূতাকলে শ্রমিক বিক্ষোভের উৎস তদন্ত করার ও যথাযথ দমনমূলক ব্যবস্থা নেবার জন্য তাঁরা অনুরোধ জানান বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে। তাতে সাড়া দিয়ে তৎকালীন ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ প্র্যাট, ৩২টি চটকল, সূতাকল ও অন্যান্য কারখানা ঘুরে এক গুরুত্বপূর্ণ গোপন রিপোর্ট পেশ করেন।[১] তাতে প্র্যাট ১৮৯৩-র শিবপুর ও হাওড়া চটকল ধর্মঘট, ১৮৯৪-র শ্যামনগর চটকল ধর্মঘট এবং ১৮৯৫-র টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, কামারহাটি চাঁপদানি ও বজবজ চটকলে ধর্মঘট ও জঙ্গী বিক্ষোভের উল্লেখ করেন। সর্বত্রই চটকলের ম্যানেজার ও বাবুরা প্র্যাটকে বলেন যে ক্রমেই শ্রমিকদের মেজাজ 'গরম হয়ে উঠছে।'[২]

এর অল্প কয়েক বছর আগে, বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর বিক্ষোভ সম্বন্ধে তদন্ত করে একটি সরকারি কমিশন ১৯৮২তে লেখে:

"বোম্বাই শহরের প্রতিটি সূতাকলে প্রায়ই শ্রমিক ধর্মঘট হয়। বেশীর ভাগ ধর্মঘটেরই কারণ, মিলমালিকরা শ্রমিকদের না জানিয়ে, তাদের বেতন কাটে মাইনে দেবার দিন। কখনও কখনও এইসব শ্রমিক ধর্মঘট চারদিনেরও বেশী চালু থেকেছে।"[৩]

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা— মিল মালিক ও সরকারি আমলা উভয়েই— প্রথম থেকেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই জাগরণ, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভকে গভীর উদ্বেগের চোখেই দেখেছে। ভারতের শিশু বুর্জোয়া শ্রেণীও এ সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ ছিল না। ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াদের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ জামশেদজী টাটা, ১৮৮৮-তেই এক প্রবন্ধে লেখেন: "একথা বুঝতে হবে যে বয়স্ক শ্রমিকরা লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছে এবং শিল্পের বিকাশ শ্রমজীবীদের প্রকৃত পরিস্থিতিও যে তারা বুঝতে শুরু করেছে, তার অস্পষ্ট আভাস তাদের চেতনাতে দেখা যাচ্ছে।"[৪]

আর ১৮৯৫-র ঠিক অর্ধশতাব্দী পরে, ১৯৪৫-৪৬-এ, ভারতের সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী বৈপ্লবিক নেতৃত্বে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্য বারবার সাধারণ ধর্মঘট করেছে, বিদ্রোহী নৌসেনার সঙ্গে সৌহার্দ্য জানিয়ে রক্তের রাখীবন্ধন করেছে, ছাত্র ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধোত্তর গণ-অভ্যুত্থান ঘটাতে সাহায্য করেছে। তার বিস্তৃত বর্ণনা এই প্রবন্ধকারের জন্য একাধিক রচনাতেই পাওয়া যাবে।[৫]

১৮৯৫ থেকে ১৯৪৫-৪৬ এই ৫০ বছর, দীর্ঘ, জটিল পথ পরিক্রমা করেছে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের শ্রমিক আন্দোলনও, কখনও মূল ধারার সঙ্গে একত্রে, কখনও স্বতন্ত্রভাবে, কখনও বা মূল ধারার খানিকটা বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু এটা খুবই দুঃখ ও আশ্চর্যের কথা যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের ধারার অবদান ও গুরুত্ব নিয়ে তেমন কোনও সর্বাঙ্গীন আলোচনা কোনও ইতিহাসবিদ এখন পর্যন্ত করেন নি। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদরা শ্রমিক আন্দোলনের ধারাটি নিয়ে কেন আলোচনা করেন নি, তা সহজেই অনুমেয়। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদরাও এই দিকটি সম্বন্ধে একেবারে নীরব থেকেছেন। মার্কসবাদী নানান মতের ইতিহাসবিদও কৃষক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ নিয়ে যতটা আলোচনা করেছেন, তার এক ভগ্নাংশও তাঁরা আলোচনা করেন নি শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে। তথাকথিত নিম্নবর্গের ইতিহাস আলোচনাই নাকি যাঁদের ধ্যানজ্ঞান, তাঁরাও সযত্নে এড়িয়ে গেছেন ভারতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা— সম্ভবতঃ সেক্ষেত্রে

কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে ইতিবাচক মূল্যায়ন করতে হত, তা তাদের পছন্দ নয়।

এদেশের ইতিহাস— আলোচকদের মধ্যে এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সুমিত সরকার, সুকোমল সেন, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, রণজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ। সুমিত সরকার সঠিকভাবেই লিখছেন ''স্বদেশী যুগের সবচেয়ে অবহেলিত, প্রায় বিস্তৃত অধ্যায় হচ্ছে শ্রমিক-বিক্ষোভ সম্পর্কে আলোচনা। এ যুগের দীর্ঘ আলোচনার সময়ে ডঃ রমেশ মজুমদার শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে মাত্র ৬ লাইন লিখেছেন। হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় এক লাইনও লেখেন নি।....এই অবহেলার প্রবণতা থেকে মুক্ত একমাত্র সোভিয়েত ইতিহাসবিদরা...।''[৬]

জাতীয় আন্দোলনের প্রথম তিন দশকের নেতৃত্ব, কি নরমপন্থী, কি তথাকথিত চরমপন্থী, কেউই জাতীয় আন্দোলনের রাজনৈতিক মঞ্চে শ্রমিক শ্রেণীকে সংগঠিত করার কথা ভাবেননি। বরঞ্চ শহরে কলকারখানার ও বস্তিবাসী শ্রমজীবীদের বিক্ষোভকে তাঁরা বেশ খানিকটা ভয়ের চোখেই দেখেছেন। টালা-চিৎপুর অঞ্চলে ১৮৯৭-তে প্রধানত মুসলিম শ্রমিক ও বস্তিবাসীদের যে গণবিক্ষোভ দেখা দেয় তার প্রধান লক্ষ্য ছিল পুলিশ ও ইংরেজ রাজপুরুষরা।[৭] তাতে শুধু ব্রিটিশ সরকার ও ইংরেজ বণিককুলই সন্ত্রস্ত হয় নি, সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন এমনকি তৎকালীন মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদীরাও। কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত ''সঞ্জীবনী'' টালার গণবিক্ষোভ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: ''এমন কি সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও কলকাতা অজ্ঞ ছিল, কিন্তু কলকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গাহাঙ্গামা সেই বিদ্রোহকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। জনসাধারণ কর্তৃক যে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা আগে কখনও দেখা যায় নি...।''[৮]

কোন কোন আধুনিক ইতিহাসবিদ টালা-বিক্ষোভের ধরণের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিবাদী আন্দোলনকে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক চেতনার আত্মপ্রকাশ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং তার স্বরূপ এই বিক্ষোভের পিছনে প্যান-ইসলাম মতবাদ বা হাজি জ্যাকরিয়ার মত ধর্মীয় নেতার প্রভাবকেই বড় করে দেখেছেন।[৯]

এই ধর্মীয় প্রবণতার দিক অবশ্যই শ্রমজীবীদের গোড়ার দিকের বহু গণবিক্ষোভেই ছিল, কিন্তু তার প্রধান জোর পড়েছিল সরকার-বিরোধী, ব্রিটিশ বিরোধিতার উপর, যার জন্য 'ইংলিশম্যান' ও 'সঞ্জীবনী' উভয়েই টালার গণবিক্ষোভকে তুলনা করেছিলেন ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সঙ্গে।

আসলে টালার গণবিক্ষোভ ও শ্রমজীবীদের এই ধরনের প্রথমদিকের বিস্ফোরণগুলির চরিত্র ছিল মিশ্র ও জটিল ধরনের। কলকাতা বা বোম্বাই শহরে ও শহরতলীতে দরিদ্র, দুর্গত জীবনযাপনের, রোগ, ক্ষুধা ও পুলিশী অনাচারের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ বারে বারে ফেটে পড়েছে এবং তার গভীরে থেকেছে, বিদেশী ইংরেজ শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধেও পুঞ্জীভূত ক্রোধ। তারই সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই জড়িয়ে থাকত ধর্মীয় বা জাতপাতের প্রবণতা।

শ্রমিক আন্দোলনের অন্য একজন ইতিহাসবিদ তাই এইসব গণবিক্ষোভের অনেক বেশী সঠিক মূল্যায়ন করে লিখেছেন: 'টালা গণবিক্ষোভের জঙ্গী শ্রমজীবী জনগণের চরিত্র ছিল মিশ্র। একদিকে তারা পুলিশ ও বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, অপরদিকে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল প্যান ইসলামিক মতবাদ.... (ভারতের) নবজাত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এই ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া, তৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রায় অনিবার্য ছিল।''[১০]

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদীদের প্রায় কেউই, ঊনিশ শতকের শেষ দশকে, এইসব নিপীড়িত, শোষিত ও বিক্ষুব্ধ শ্রমজীবীদের পক্ষে মত প্রকাশ করেন নি। সামান্য ২।৩ জন ছিলেন এর ব্যতিক্রম, যাঁরা এই যুগেই কলকাতা ও শহরতলীর শ্রমজীবীদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আইনজীবী অশ্বিনী ব্যানার্জীর নাম সর্বাগ্রগণ্য। তাছাড়া শ্রমিক ধর্মঘটের সঙ্গে খানিকটা সহমর্মিতা দেখিয়েছেন সুরেন ঠাকুর— রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ও পরে অনুশীলন সমিতির কোষাধ্যক্ষ।

১৮৯৯-এ বোম্বাইতে জি.আই.পি. সিগন্যালারসরা ধর্মঘট করলে, তাদের কেন্দ্রীয় সৌহার্দ্য সমিতির প্রধান পুরুষ ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তিনি কলকাতায় সুরেন ঠাকুরকে চিঠি লেখেন, এই ধর্মঘটের পাশে জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন গড়ে তুলতে। সুরেন ঠাকুর, অশ্বিনী ব্যানার্জিকে চিঠি লেখেন, এই উদ্যমে তাঁকে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে।[১১]

বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময়, জাতীয় আন্দোলনের সমর্থনে বাংলাদেশে শ্রমিকদের বহু ধর্মঘট হয়— হাওড়ার বার্ণ কোম্পানীতে, বাউড়িয়ার চটকলে, ছাপাখানায়, রেলে।[১২] কিন্তু এইসব ধর্মঘটী শ্রমিক ও কর্মচারীদের শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশী ছিলেন বাঙ্গালী। অতএব এইসব ক্ষেত্রে শ্রমিক ও শ্রমজীবীদের শ্রেণীচেতনা থেকে তাঁরা কতটা এই সব ধর্মঘট করেছিলেন, আর কতটা বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের প্রভাব, তা অবশ্যই বিবেচ্য।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ১৯০৫ থেকে ১৯০৮, স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা বঙ্গদেশেই সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় দাবীর সমর্থনে, শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন রাজনৈতিক পদক্ষেপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তিনটি

ঘটনা বাংলার বাইরেই ঘটেছিল। পাঞ্জাবে, দুই চরমপন্থী নেতা লাজপৎ রায় ও অজিত সিং-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। তার প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজ সরকার লাজপৎ রায় ও অজিত সিংহকে ভারত থেকে নির্বাসিত করেন। এই প্রচণ্ড দমননীতির প্রতিবাদে ১৯০৭-এ রাওয়ালপিণ্ডির রেল ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের হিন্দু, শিখ ও মুসলিম শ্রমিকরা সমবেতভাবে ধর্মঘট ও হরতাল পালন করে।[১৩]

দক্ষিণ ভারতে চরমপন্থী নেতা সুব্রহ্মণ্য শিব, নিয়মিতভাবে টিউটিকরিনের ইংরেজ মালিকানাধীন সূতাকলগুলি শ্রমিকদের কাছে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রচার করতেন ও ধর্মঘট করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে অচল করে দেবার আহ্বান জানাতেন। ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন, যে পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের মুক্তি আসবে, একমাত্র এই ধরণের বিপ্লবের মাধ্যমেই।[১৪]

সুব্রহ্মণ্য শিব ও চিদাম্বরম পিল্লাইকে সরকার গ্রেপ্তার করলে, ১৯০৮-এর ১১ থেকে ১৩ মার্চ টিউটিকরিন ও তিনেভেলিতে শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট ও গণবিক্ষোভ সংগঠিত হয়।[১৫] শ্রমিকশ্রেণীর এই ধর্মঘট ও সংগ্রামকে অভিনন্দন জানায় কলকাতার ''বন্দেমাতরম'' পত্রিকা।[১৬]

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে বোম্বাইতে, ১৯০৮-এর জুলাই মাসে ইংরেজ বিচারক কর্তৃক তিলকের ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ ঘোষণা করার পর। ২৩ জুলাই বোম্বাই-এর কয়েক লক্ষ শ্রমিক এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। ২৪ জুলাই পুলিশ শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়। জবাবে লক্ষাধিক শ্রমিক ও বস্তীবাসী গরীব ব্যারিকেড রচনা করে গণপ্রতিরোধ সংগঠিত করে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় ধর্মঘটের অন্যতম শ্রমিক নেতা গণপৎ গোবিন্দ সহ বহু শ্রমজীবী। ব্যারিকেড সংগ্রামের সময় সংগ্রামী শ্রমিকরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ধ্বনি দিতে থাকে ও স্লোগান উঠায়। ''তিলক-মহারাজ কি জয়''।[১৭]

ধর্মঘটের তৃতীয় দিনে গুজরাটি ও মারাঠি ভাষাতে ইস্তাহার প্রকাশিত হয়, যাতে লেখা থাকে ''জাতির প্রাণ তিলককে যদি বন্দী করা হয়, তবে জাতি কি করে বাঁচবে'?' এবং ইস্তাহারের শেষে লেখা থাকে ''স্বদেশীর জয় হোক।''[১৮]

বহুদূর থেকে লেনিন, বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর এই গণসংগ্রামকে অভিনন্দিত করে লিখলেন: ''ভারতেও সর্বহারা শ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক গণসংগ্রামের পথে পা বাড়িয়েছে। তাই, এখন আমি স্থিরনিশ্চিত, যে ভারতে ইংরেজ স্বৈরশাসনের পতন অনিবার্য।''[১৯]

শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব তিলক ব্যতীত অন্য কোনও জাতীয় নেতা সেই যুগে আদৌ উপলব্ধি করতে পারেননি। শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একটা সক্রিয় মৈত্রী গড়ে উঠলে যে তা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিতে পারে তা ইংরেজ ধনিক শ্রেণীর মুখপত্র বুঝতে পেরেছিলেন এবং শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিক্ষোভের প্রসারকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার সুপারিশ করেছিল।[২০]

বাংলার জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একমাত্র ''নবশক্তি'' লিখেছিল: ''শ্রমিকশ্রেণী যতদিন না স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগ করতে অগ্রসর হবে, ততদিন বিদেশীর শৃঙ্খল ভাঙ্গা যাবে না। দমননীতির বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদ কি ভাবে করতে হয়, তার পথ দেখাচ্ছেন রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী কি তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন না?'[২১]

গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতে স্বরাজের দাবীতে ব্যাপক গণআন্দোলনের যুগ শুরু হলে, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক আন্দোলন সেখানেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ছাপ রাখে। প্রথমত: পূর্ণ স্বাধীনতাই যে ভারতের জাতীয় দাবী হওয়া উচিত একথা ১৯২১-এ আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে উত্থাপন করে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী প্রতিনিধি কমিউনিস্টরাই।[২২] ১৯২৭ মাদ্রাজে কংগ্রেস অধিবেশন বোম্বাই-এর রেলশ্রমিক নেতা কে. এন., যোগলেকর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রভাব আনলে, জওহরলালের সমর্থনে তা গৃহীত হয়।[২৩]

১৯২৮-এ কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের বনেদী নেতৃত্ব ডোমিনিয়ন স্টেটাসকেই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন। সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল ও সংগ্রামপন্থীদের সমর্থিত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সম্বলিত সংশোধনী অল্প ভোটে পরাজিত হল। পরদিন অর্ধলক্ষ সংগঠিত শ্রমিকদের মিছিল কংগ্রেস অধিবেশনে এসে পূর্ণ স্বাধীনতাকেই তাদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করল। কংগ্রেসের সরকারি ইতিহাসবিদ লিখছেন: ''কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন ৫০ হাজার শ্রমিকের এক সুশৃঙ্খল মিছিলের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারা দুই ঘণ্টার জন্য মণ্ডপ দখল করে, জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করে।''[২৪]

১৯২৭-২৮-এ বোম্বাই, বাংলা ও উত্তর প্রদেশে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত জঙ্গী সাধারণ ধর্মঘট, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক নতুন অস্ত্র দেশবাসীর সামনে হাজির করল। এই যুগের বর্ণনা দিতে গিয়ে, শ্রমিক আন্দোলনের একজন প্রখ্যাত অ-কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদ

লিখছেন: ''কমিউনিস্টরা ধর্মঘটের নেতৃত্ব দখল করতে পেরেছিল, কারণ তারা শ্রমিকদের মেজাজ ঠিকমত বুঝতে পেরেছিল এবং শ্রমিকদের দাবীর সেরা সমর্থক হিসাবে জোরদার লড়াই করেছিল।....তাড়াহুড়ো করে শ্রমিকদের উপর ধর্মঘট চাপিয়ে দেবার চেষ্টা তারা করে নি। নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা শ্রমিকদের বুঝতে দিল এবং যখন সাধারণ ধর্মঘটের জন্য শ্রমিকদের মন-মেজাজ তৈরী, একমাত্র তখনই তারা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল।....তাছাড়া স্বীকার করতেই হবে যে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করত, সম্পূর্ণ নির্ভীক এবং আদর্শের প্রতি গভীর নিষ্ঠাবান ছিল।''[২৫]

এই যুগে শ্রমিক আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করে। ১৯২৮-এর ৩ ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন ভারতে এসে বোম্বাই বন্দরে নামলে, সারা ভারত জুড়ে 'সাইমন ফিরে যাও' বিক্ষোভ হয়। তাতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা নেয় বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী, সাধারণ ধর্মঘট ও বোম্বাই শহরে ৩০ হাজার জঙ্গী মিছিল সংগঠিত করে। তাদের রণধ্বনি ছিল: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।[২৬]

এর ঠিক এক বছর পরে বার্লিন থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখলেন: ''সাম্রাজ্যবাদ নির্ভুলভাবেই তার সবচেয়ে মারাত্মক ও দৃঢ়চেতা শত্রুকে চিনতে পেরেছে—সেই শত্রু ভারতের সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী।''[২৭]

সাম্রাজ্যবাদী প্রধান, বড়লাট আরউইনও কেন্দ্রীয় লাট-পরিষদে বক্তৃতায় বল্লেন: ''কিছুদিন ধরে ভারতে কমিউনিজমের অস্বস্তিকর প্রভাব, আমাদের সরকারের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।''[২৮]

ভারতে আবার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার আগেই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করা, ব্রিটিশ সরকার তার প্রথম কর্তব্য বলে বেছে নিয়েছিল। ১৯২৯-এর সূচনাতেই বড়লাট আরউইন, ভারত সচিবকে লণ্ডনে এক গোপন তারবার্তায় লিখলেন ''ভারতের পরিস্থিতি যথেষ্ট বাঁ দিকে মোড় নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে বড়রকমের গোলমালের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।''[২৯]

এর ঠিক একমাস পরে, ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব হেগ, সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের কাছে এক জরুরী নির্দেশ পাঠালেন: ''ভারতীয় বিপ্লবীরা ও কমিউনিস্টরা হাত মেলাতে চলেছে। খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি, এইসব চরমপন্থীদের শক্তি বেশী বাড়তে দেওয়া মোটেই উচিত নয়।''[৩০]

ভারতে ইংরেজ গোয়েন্দা প্রধান ইসমঙ্গার সুপরিশ করলেন যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা করা হোক। এই মামলার উদ্দেশ্য হবে ''পার্টির সংগঠনকে ভেঙ্গে চুরমার করা, নেতাদের গ্রেপ্তার করা...''[৩১]

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে একথাও স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণআইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবার পর যদি শ্রমিকশ্রেণী কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিশেষতঃ রেলে সাধারণ ধর্মঘট করত, তাহলে ভারতে ইংরেজ শাসন ভেঙ্গে পড়ার মুখোমুখি এসে দাঁড়াত। তাই তার আগেই সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ববিহীন করা দরকার। প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যেই শুরু করা হয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৯-এর ২০ মার্চ।

তৎকালীন জাতীয় আন্দোলন, সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের এই আক্রমণের তাৎপর্য ধরতে না পারলেও, তা খানিকটা ধরা পড়েছিল জওহরলাল নেহরুর চেতনাতে। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতা ওয়াল্টার সিদ্রিনকে পাঠানো তারবার্তাতে জওহরলাল লেখেন: ''আমি একথা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে মীরাট মামলাকে ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলবে না। সরকার সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের উপর যে আক্রমণ শুরু করেছে, এটা তারই অংশ। একথা ঘোষণা করেছে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যকরী সভা। একথা মানতে বাধ্য হয়েছে এমনকি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও।''[৩২]

অথচ খুবই আশ্চর্যের কথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রায় কোনও ইতিহাসবিদই ১৯২৯-৩০'এ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে, বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণীর এই ভূমিকা এবং তার শক্তি খর্ব করে জাতীয় আন্দোলনকে আঘাত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোনও গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

সংগ্রামের পদ্ধতির (Forms of Struggle) ব্যাপারেও এই সময়ে শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় আন্দোলনে নতুন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে আসে। ১৯৩০-এর এপ্রিল মাসে কলকাতায় কমিউনিস্ট ও বামপন্থী নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান গাড়োয়ানদের ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট হয়। চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা রাজপথে ব্যারিকেড রচনা করে সংগ্রাম করে। সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ খানিকটা আপস করতে বাধ্য হয়, যদিও তারপর ধর্মঘটের নেতা আবদুল মোমিন, বঙ্কিম মুখার্জী প্রভৃতিকে তারা গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ড দেয়।[৩৩]

তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে। ১৯৩০-এর মে মাসে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের পর, শোলাপুরের রেল ও সুতাকল শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট ও গণউত্থান সংগঠিত করে চার দিনের জন্য শহরে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়।

পরে বোম্বাই থেকে বিরাট ইংরেজ ফৌজ এসে রক্তের স্রোতে শোলাপুর শ্রমিক বিদ্রোহকে দমন করে।[৩৪] গণউত্থানের চারজন নেতার ফাঁসী হয়, গুলি করে হত্যা করা হয় বহু শ্রমিককে, কিন্তু শোলাপুর সারা ভারতের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের কাছে এক নতুন প্রেরণাস্থল হয়ে দাঁড়ায়।[৩৫]

তবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে ঐতিহাসিক অবদান ঘটে স্বাধীনতা সংগ্রামের একেবারে শেষ পর্বে— ১৯৪৫-৪৬-এ। সমগ্র পূর্ব এশিয়াতে সশস্ত্র গণসংগ্রামের পথে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া ও বর্মার জনগণ। ভারতের জনগণও সেই পথে পা বাড়িয়েছিলেন। ১৯৪৫-এর ২১ নভেম্বর কলকাতার গণবিস্ফোরণের মাধ্যমে তার সূচনা হয়, আর ১৯৪৬-এর ১৮ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি নৌবিদ্রোহের মাধ্যমে তার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা দেয়।

কলকাতা, বোম্বাই, লাহোর, কানপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ, সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণী সাধারণ ধর্মঘটীদের সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের সঙ্গে ব্যারিকেডের সংগ্রাম করে, ইংরেজ শাসনকে অচল করে দেয়।[৩৬] বোম্বাই-এর রক্তাক্ত সাধারণ ধর্মঘটে শহীদ হন তিন শতাধিক শ্রমিক।[৩৭] ভারতে তৎকালীন ইংরেজ সর্বাধিনায়ক অচিনলেক, লণ্ডনে মন্ত্রীসভাকে জরুরী গোপন পত্রে জানান (১ ডিসেম্বর ১৯৪৫) যে ভারতে শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট ও সেনাবাহিনীর বিক্ষোভে যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে হয় বিরাট ইংরেজ সেনাদল দিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে হবে, নয়তো এখনই ভারতের জাতীয় নেতাদের সঙ্গে আপস করতে হবে।[৩৮]

নৌবিদ্রোহের সমর্থনে ভারতব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘটের পরদিনই, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেম অ্যাটলি, ভারতে পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণাটি করলেন।[৩৯] এটা নিশ্চয় কাকতালীয় নয়। আরও তিনদিন পরে প্রধান সেনানী অচিনলেক, অ্যাটলিকে গোপন সতর্কবাণী পাঠালেন: ''সমগ্র ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট দেশব্যাপী গণবিদ্রোহের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হতে পারে।''[৪০]

এসব দলিলপত্রই গত এক দশকের উপর সমস্ত ইতিহাস গবেষক ও লেখকদের জানা আছে। তথাপি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষপর্বে শ্রমিক শ্রেণীর ও সশস্ত্র বাহিনীর বৈপ্লবিক ভূমিকাকে তাঁরা অবহেলাই করেছেন। এ কাজ সজ্ঞানেই করা হয়েছে। অথচ তাতে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের মূল্যায়ন হয়নি।

১৯৫৪তে ভারতের একজন প্রথম সারির কমিউনিস্ট নেতা এই যুগের সঠিক মূল্যায়ন করে, শ্রমিকশ্রেণী, সশস্ত্র বাহিনী ও ও মেহনতী জনগণের ভূমিকাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে লিখেছিলেন যে ''দেশ যদি এই পর্বে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের আপস পরামর্শ না মেনে বিভিন্ন পথে যেত, তাহলে ১৯৪৭-এর পদ্ধতিতে নয়, গুণগত উন্নত পদ্ধতিতে স্বাধীনতা লাভ করত ভারতবর্ষ।''[৪১] জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের এই ধারাটি যথার্থ মূল্যায়নের এখনও অপেক্ষায় আছে।

---

১. পুলিশ সুপারভিসন ইন দি রিভারাইন মিউনিসিপ্যালিটিজ জুডিশিয়াল পুলিশ নং ৬-১১, জানুয়ারি ১৮৯৬, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা—। রণজিৎ দাশগুপ্ত: পভার্টি অ্যাণ্ড প্রোটেষ্ট: এ স্টাডি অব ক্যালকাটাজ ওয়ার্কিং ক্লাস অ্যাণ্ড লেবারিং পুওর (১৮৭৫-১৯০০), ১৯৮৩

২. ঐ

৩. ভি.বি. কার্ণিক: ষ্ট্রাইকস ইন ইণ্ডিয়া, বোম্বে, ১৯৬৭, পৃ. ৬

৪. মরিস. ডি. মরিস: দ্য এমারজেন্স অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল লেবার ফোর্স ইন ইণ্ডিয়া, পৃ. ৫৪

৫. গৌতম চট্টোপাধ্যায়: দ্য অলমোস্ট রিভল্যুশন, এস.সি. সরকার ফেলিসিটেশন ভল্যুম, দিল্লী, ১৯৭৬

৬. সুমিত সরকার: দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট ইন বেঙ্গল (১৯০৩-০৮), দিল্লী, ১৯৭৩ পৃ. ১৮২

৭. দি ইংলিশম্যান, ২ জুলাই, ১৮৯৭

৮. সঞ্জীবনী, ৩ জুলাই ১৮৯৭, আর.এন.পি., ১৮৯৭, ৯০ জুলাই-এর রিপোর্ট

৯. দীপেশ চক্রবর্তী: কম্যুনাল রায়ট অ্যাণ্ড লেবার, অকেশনাল পেপার নং ১১, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্স, কলকাতা, ১৯৭৬

১০. রণজিৎ দাশগুপ্ত: পভার্টি অ্যাণ্ড প্রোটেষ্ট: এ স্টাডি অব ক্যালকাটাজ ওয়ার্কিং ক্লাস অ্যাণ্ড লেবারিং পুওর ১৮৭৫-১৯০০, ১৯৮৩, পৃ. ২৫৪

১১. গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ চৌধুরী (সম্পাদিত): সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। কলকাতা, ১৯৭২

১২. সুমিত সরকার: দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৯০৩-০৮), পৃ. ১৯২-২৩৮

১৩. বেঙ্গলি ৪ মে, ১৯০৭ এবং সুমিত সরকার: পূর্বোদ্ধৃত, পৃ. ২৪৫

১৪. সুমিত সরকার: ঐ

১৫. ঐ

১৬. হরিদাস ও উমা মুখার্জি: শ্রীঅরবিন্দ অ্যাণ্ড দি নিউ থট ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিকস, ১৯৬৪, পৃ. ২৮৬-৮৮

১৭. টাইমস অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ২৫ জুলাই ১৯০৮

১৮. ডি.সি. হোমে: বম্বে ওয়াকার্স ফার্স পলিটিক্যাল ষ্ট্রাইক, ১৯০৮, মাসিক নিউ এজ জুন, ১৯৫৩

১৯. ভ. ই. লেনিন: বিশ্ব রাজনীতিতে দাহ্য পদার্থ ৫ আগস্ট, ১৯০৮
২০. পাইওনিয়ার, এলাহাবাদ, ২৭ আগস্ট ১৯০৬
২১. নবশক্তি, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৭, সুমিত সরকার পূর্বোদ্ধৃত, পৃ. ২৫১
২২. পট্টভি সীতারামাইয়া: হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রথম খণ্ড
২৩. ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিষ্টার, ১৯২৭, ২য় খণ্ড
২৪. সীতারামাইয়া: হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩২
২৫. ভি.বি. কার্নিক: ষ্ট্রাইকস ইন ইণ্ডিয়া পৃ. ১৯২-৯৩
২৬. টাইমস অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮
২৭. ইনপ্রেকর, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯
২৮. কেন্দ্রীয় আইন সভার বিবরণী ২৮ জানুয়ারি, ১৯২৯
২৯. গোপন তার নং ২৫৫৫, ১৯ জানুয়ারী ১৯২৯ ফাইল নং ১৮৪।২৯, ইণ্ডিয়া অফিস পাঠাগার, লণ্ডন
৩০. হেগের চিঠি ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯, ফাইং নং ১৮৪।২৯, ইণ্ডিয়া অফিস পাঠাগার, লণ্ডন
৩১. ইসমঙ্গারের মেমোরাণ্ডাম, ১৭ জানুয়ারি ১৯২৯, হ্যালিফ্যাক্স পেপার্স, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১১
৩২. সি.এইচ. ফিলিপস (সম্পাদিত): দ্য ইভল্যুশন অব ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান, লণ্ডন, ১৯৬৫ পৃ. ২৬০
৩৩. স্টেটসম্যান কলকাতা, ৫ এপ্রিল, ১৯৩০ এবং আবদুল মোমিন: কলকাতার গাড়োয়ান ধর্মঘটের চারদিন (১-৪ এপ্রিল ১৯৩০), ১৯৮০
৩৪. টাইমস অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ১৩ মে ১৯৩০
৩৫. চ্যালেঞ্জ, দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ. ৩৫৪-৩৫৯
৩৬. অমৃত বাজার পত্রিকা, কলকাতা ২২ ও ২৩ নভেম্বর ১৯৪৫ এবং ১২, ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬
৩৭. টাইমস অব ইণ্ডিয়া বোম্বাই, ১৯-২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬
৩৮. ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ষষ্ঠ খণ্ড, (১৯৪৫-৪৬) ২৫৬ নং ডকুমেন্ট
৩৯. স্টেটসম্যান, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬
৪০. ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ষষ্ঠ খণ্ড, ৪৫৮ নং ডকুমেন্ট
৪১. ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদ: মুখবন্ধ, সুব্রত ব্যানার্জি: দি আর.আই.এন. স্ট্রাইক, ১৯৫৪

(বানান অপরিবর্তিত)

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বই *ইতিহাস চর্চা, জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা* (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৮৫) থেকে প্রবন্ধটি নেওয়া হল।

UTTORA

Good Living Got Better

Our New Project

At

Bagdogra, Darjeeling District

Luxmi Portfolio Ltd.

Issue date 16 March 2020. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 8, Issue 6 Arek Rakam

mio amore™
THE CAKE SHOP

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.

Rs. 30